সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

প্রজেক্ট X-15

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

প্রোজেক্ট X-15

কাজী আনোয়ার হোসেন

গলার ভিতরটা ফুলে উঠতে শুরু করল, গিঁঠ পাকিয়ে যাচ্ছে শ্বাসনালী। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শক্ত করে বাঁধা গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে গেল। চেতনা হারাচ্ছে সে দ্রুত। সারাশরীর ঝাঁকি খেতে শুরু করল। ভাঙা মেরুদণ্ডের হাড় ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে দিল কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ব্লাড ভেসেল, পেশি আর শিরা। ফুসফুসের অন্তত ছয়টা জায়গায় ফুটো করল ভাঙা পাঁজরের হাড়। জিভ বেরিয়ে এলো দাঁতের ফাঁক দিয়ে, পরক্ষণেই প্রবল মোচড় খেল সে। খট করে বাড়ি খেল দাঁতের সঙ্গে দাঁত। জিভটা কেটে টুপ করে খসে পড়ল নীচে। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বাঁধতে শুরু করল। শেষ কয়েকটা মুহূর্ত অসহ্য যন্ত্রণা পেল লোকটা, তারপর মিলল চিরমুক্তি।

রানা! সময় থাকতে পালাও, নইলে তোমারও এই একই পরিণতি হবে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৩৮

প্রোজেক্ট X-15

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ মাসুদ হোসেন রানা
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইট্রে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা ৩৩৮

প্রজেক্ট X-15

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7338-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-338
PROJECT X-15
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চৌত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

শীত আসছে বরফে মোড়া জনবিরল অ্যান্টার্কটিকায়। দুপুর দুটো থেকেই আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে। আর মাত্র কয়েকদিন, তারপরই দীর্ঘ রাত নামবে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম, বিরান, এই সফেদ বরফের রাজ্যে।

ম্যাকমার্ডো সাউন্ড আর রস্ সাগরের একশো মাইল অভ্যন্তরে স্থলভূমিতে আবহাওয়া ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে গেছে। দ্রুত আরও বিস্তৃত হচ্ছে মেঘ, সেই সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে দমকা বাতাসের গতি। কালো মেঘের ঘনঘনটা আকাশে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রি নীচে, পাগলা বাতাস বয়ে চলেছে, তুষার উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আইস ক্যাপের উপর।

কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও, বাতাসে দুলছে না কোন গাছ। উপযুক্ত সময়ে উত্তরসুরিদের বিকাশের সুযোগ রেখে শ্যাওলা আর ফাঙ্গাসগুলোও এবছরের মতো মৃত্যু বরণ করেছে। বাতাসে ওড়া তুষার ছাড়া আর কোথাও কোন নড়াচড়ার আভাস নেই। হাওয়ার হাহাকার বাদ দিলে চারপাশে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

কিন্তু ধূসর সন্ধ্যায় সাদার পটভূমিতে হঠাৎ খুদে একটা কালো দাগ দেখা গেল। পরক্ষণেই হারিয়ে গেল উড়ন্ত তুষারের দেয়ালের ওপারে। আবার যখন বের হলো, অনেক কাছে চলে

এসেছে, আইস ক্যাপের উপর দিয়ে অন্তত বিশ মাইল গতিতে ছুটে চলেছে।

একটু পরেই বাতাসের টানা হুঙ্কার ছাপিয়ে উঠল ভারী ইঞ্জিনের একটানা নিচু গম্ভীর গুঞ্জন। বড় একটা স্নো-ট্র্যাক, দীর্ঘ স্লেড টেনে নিয়ে চলেছে। একটা ঢালের উপরে উঠে এলো, থামল তারপর। ইঞ্জিন চালুই থাকল।

স্টিয়ারিং কলামের উপর ঝুঁকে এলো ড্রাইভার, ভারী গ্লাভস্ পরা হাতে উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিকে জমে যাওয়া বরফ পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। জমাট বরফের কারণে সামনেটা দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। আস্তে করে মাথা নাড়ল লোকটা। তার চোখ আবার স্থির হলো হোমিং ইন্সট্রুমেন্টের ডায়ালের উপর।

প্রকাণ্ডদেহী মানুষ সে, ভারী গরম কাপড়ের কারণে আরও বড় দেখাচ্ছে। ডান হাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল, অধৈর্য ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিল ডায়ালের গ্লাসে। কাঁটা নড়ল সামান্য, তারপর আবার আটকে গেল নিউট্রাল পজিশনে।

নষ্ট হয়ে গেছে ইন্সট্রুমেন্ট। প্রথমে টের পায়নি কোন কাজেই আসছে না। মালয়েশিয়ান গ্যারাজ থেকে চুরি করা জিনিস। মেরামত করা হয়নি স্নো-ট্র্যাকটা ঠিক মতো। পিছনে ফেলে আসা সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি এরমধ্যে তার। আসলে দরকার মনে করেনি। তারা যাবে অন্যদিকে, মাউন্ট স্যাবিনের নীচে যাবে না।

কয়েক মাইল এসেই সমস্যাটা সে বুঝতে পেরেছে। বারবার চেষ্টা করেছে, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। এখন বুঝতে পারছে, দলের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। রেডিও-ও কাজ করছে না।

নীরবে বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল লোকটা, পুরু মিটেন পরে নিয়ে চোখে চাপাল রোদচশমা, ক্যাবের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলে বয়ে চলেছে বাতাস, বাধা ঠেলে এগোনো শক্ত। তুষারের ভিতর দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে কার্গো স্লেডের দিকে, আরেকবার ভাল মতো পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলো। না, পঁচিশটা গ্যাস কন্টেইনারই ঠিক মতো বাঁধা আছে।

কাজটা শেষ করে শিউরে উঠল লোকটা। শীতের কারণে নয়। ভয়ে। আতঙ্ক বোধ করছে সে। আবার কষ্টকর ফিরতি পথ। পায়ে পায়ে একসময় পৌঁছে গেল স্নো-ট্র্যাকের কাছে। ক্যাব থেকে একটা নাইট্রোজেন ভরা বিনকিউলার বের করে বরফের ধু-ধু প্রান্তর আর বহুদূরের আবছা দিগন্ত দেখল। পরিচিত চিহ্ন খুঁজছে তার অস্থির দু'চোখ।

বাতাসে ওড়া তুলোর মতো তুষারের ভিতর দিয়ে ধূসর দিগন্ত ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে।

ক্যাবে ঢুকে ম্যাপ বের করল লোকটা। ক্ষণিকের জন্য একবার উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আবার ম্যাপে মনোযোগ দিল। মনকে বুঝ দিচ্ছে, এখনও হারিয়ে যায়নি!

কিন্তু বারবার দুশ্চিন্তা আসছে মনে। আবহাওয়া রিপোর্টে বলেছে, অ্যান্টার্কটিকার প্রথম-শীতের-ঝড় আসতে পারে সে-সম্ভাবনা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ।

এখন মনে হচ্ছে সে-আশঙ্কাই ঠিক হতে চলেছে। সত্যি যদি তীরবর্তী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুনোর আগেই পুরোমাত্রায় তুষার-ঝড় শুরু হয়, তা হলে মরতে হবে। তাকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকবে না কারও। যোগাযোগের উপায় নেই। পালানোর পথ নেই। আশ্রয় নেই। কয়েকবার সে চক্কর দিয়েছে সঙ্গীদের খোঁজে। লাভ তো হয়ইনি, ক্ষতি হয়েছে তাতে। সঙ্গীদের দেখা পায়নি, দিকজ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়েছে সে।

এখন আর ফিরে যাওয়ার চেষ্টা অর্থহীন। শুধু সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সামনে। মনে মনে বারবার কথাটা আউড়াল সে.

ম্যাপটা রেখে দিয়ে স্নো-ট্র্যাকের গিয়ার দিল, নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। তুষারে গভীর দাগ ফেলছে স্নো-ট্র্যাক, কিন্তু সামান্য পরেই ভরে যাচ্ছে দাগগুলো মিহি তুষারের কণায়।

দশ মিনিটের বেশি পেরিয়ে গেল। অন্ধকার নেমেছে বরফের রাজ্যে। তুষারপাত এতোই বেড়ে গেছে যে হেডলাইট জ্বালা না জ্বালা সমান কথা। দু'ফুট দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

থামল লোকটা, ক্যাবের দরজা খুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাতাস এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরাল। বাতাসের দাপটে দরজা খোলা গেল না। ঘনঘন ঝাঁকি খাচ্ছে স্নো-ট্র্যাক, স্প্রিঙের উপর দুলছে।

'বাতাসের গতি হতে পারে একশো ষাট কিলোমিটারের বেশি,' সতর্ক করে দিয়েছিল ওয়েদার ফোরকাস্টাররা।

পারলেও ক্যাব থেকে নামা ঠিক হবে না। হারিয়ে যেতে পারে সে, শীতে জমে মৃত্যু হবে তা হলে। কিন্তু ইঞ্জিন চালু করে ক্যাবে যদি বসে থাকে, তা হলেও মাথার উপরে এগযস্ট পাইপ তুষার জমে বন্ধ হয়ে যাবে, মরতে হবে কার্বন-ডাই অক্সাইড বিষক্রিয়ায়। আবার অন্ধের মতো এগোলেও গভীর কোন খাদে পড়ে মরবার সম্ভাবনা।

কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকল সে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গিয়ার দিল, সামনে বাড়ল আবার। স্রেফ আন্দাজের উপর নির্ভর করে উপকূলের দিকে চলেছে। জানে না আসলে দক্ষিণ মেরুবিন্দুর দিকে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বারবার ভয়ঙ্কর কার্গো আর বাড়িতে রেখে আসা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা ঘুরেফিরে মনে আসছে তার।

আর ছয়মাস। মাত্র ছয়মাস। তারপরই এই দোজখ থেকে ছাড়া পাবে সে। ছুটি দেবেন, কথা দিয়েছেন বস্। চারবছর পর ফিরতে পারবে দেশে, স্বপ্নের আমেরিকায়, আত্মীয়-স্বজনের কাছে!

ভয় লাগছে তার। সেই প্রথম থেকেই। এখন প্রথম বারের মতো কথাটা স্বীকার করল নিজের কাছে। স্নো-ট্র্যাকের স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে তাকাল—তিরিশের উপরে দেখাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে কোথায় সে? আবহাওয়া ভাল থাকলেও এই গতি অনেক বেশি। আর খারাপ আবহাওয়ায় এ-গতি স্রেফ পাগলামি। তবু তার পা এক্সালেরেইটারে আরও চেপে বসল।

বসন্তে ছুটি হবে, বাড়ি ফিরতে পারবে…যদি আজ বেঁচে যায়।

বাচ্চারা এতোদিনে নিশ্চয়ই স্কুলে পড়ছে। স্কুলে ক্লাস থাকবে ওদের। তাতে সমস্যা নেই। কী করবে ঠিক করে ফেলেছে সে। বন্ধুবান্ধবদের বলেছে, বাড়ি ফিরে প্রথমেই ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে অন্তত এক মাসের জন্য ছুটি নেওয়াবে, তারপর ঘুরে বেড়াবে ওদের নিয়ে। পড়ায় খানিক পিছিয়ে যাবে ওরা, তাতে কী! সারাটা জীবন পড়ে আছে ওদের পড়বার জন্য। পরিবার নিয়ে দক্ষিণে যাবে সে, রোদেলা সৈকতে ছুটি কাটাবে। সাঁতার কাটবে, ছোট্ট নৌকো নিয়ে নীল শান্ত সাগরে ঘুরে বেড়াবে, মাছ ধরবে, অলস সময় কাটাবে একান্ত প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রাণ ভরে।

স্পীডোমিটারের গতিসূচক কাঁটা এখন পঞ্চাশের ঘরে থরথর করে কাঁপছে। পাথরের মতো শক্ত এবড়োখেবড়ো বরফের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে স্নো-ট্র্যাক। নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই বললেই চলে। বাইরে চলছে বাতাসের তাণ্ডব, কখনও কখনও গতি উঠে যাচ্ছে ঘণ্টায় দুশো কিলোমিটারেরও বেশি। অ্যান্টার্কটিকায় শুরু হয়েছে বছরের প্রথম সত্যিকারের প্রবল তুষার-ঝড়।

স্নো-ট্র্যাকের সামনের স্কি দুটো যখন হঠাৎই খাদের পাড় পেরিয়ে গেল, তার বুঝতে দেরি হলো না, এটা পার হওয়া সম্ভব নয়। মেশিনটা সামনে ঝুঁকতে শুরু করল, নেমে যাচ্ছে হড়হড় করে। বিরাট চওড়া, গভীর খাদ! আতঙ্কিত মরণ চিৎকার বেরিয়ে

এলো ড্রাইভারের গলা চিরে। শূন্যে যেন লটকে থাকল মেশিনটা, তারপর পিছনের বিপজ্জনক কার্গো ভরা স্লেড নিয়ে তীব্র গতিতে নামতে শুরু করল নীচের দিকে।

প্লাস্টিকের উইন্ডশিল্ডে মাথা ঠুকে গেল লোকটার, চিড় ধরে গেল প্লাস্টিকে। খাদের পাড়ে ধাক্কা খেল স্নো-ট্র্যাক। কন্ট্রোল কলাম চেপে এলো তার বুকের উপর, পাঁজরের তিনটে হাড় ভাঙল মুড়মুড় করে।

কাত হয়ে পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদের তুষারে ঢাকা মেঝেতে পড়ল স্নো-ট্র্যাক। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে বাম হাত ভাঙল ড্রাইভারের, ঊরুর সকেট থেকে খুলে গেল ডান পা-টা। কয়েক জায়গায় ভেঙে গেল মেরুদণ্ডের হাড়। তীব্র ব্যথা! চোখে অন্ধকার দেখল সে। উপর থেকে স্নো-ট্র্যাকের পিঠে চেপে বসল ভারী কার্গো স্লেড। ধাতব সংঘর্ষ আর পতনের শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিল।

নীরবতা নামল তারপর। এখনও চেতনা হারায়নি সে।

শেষ। সমস্ত কিছু শেষ! মন বলছে মারা যাচ্ছে সে। কিছুই করবার নেই তার। তবু বাঁচবার স্বাভাবিক ইচ্ছেয় নড়তে চেষ্টা করল সে। বের হতে হবে মেশিন থেকে। মনটা কেঁদে উঠল স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা ভেবে। ওদের উচ্ছল হাসি শুনতে ইচ্ছে করল বড়।

অনেক উপরে হুঙ্কার ছাড়ছে তুষার উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঝড়ো হাওয়া। ঝড়ের দাপট আর আওয়াজ এখন অনেক দূরে। কিন্তু আরেকটা আওয়াজ কানে এলো তার। বাইরে। ডানদিকে। কিছুটা উপরে।

অনেক চেষ্টায় ডানদিকে মাথা ঘোরাল সে, উপর দিকে তাকাল। জ্বলন্ত হেডলাইটের ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেল ছোট একটা স্টীলের কন্টেইনার স্নো-ট্র্যাকের ছাদের উপরে পড়ে আছে। হিসহিস আওয়াজটা বের হচ্ছে ওটা থেকেই। সিলিন্ডার ফুটো হয়ে গেছে।

আলসেমি লাগছে বড্ড, তারপরও মনের উপর জোর খাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করল ড্রাইভার। কয়েক ইঞ্চি সরতে পারল।

চোখের পিছনে ভয়ঙ্কর জ্বলুনিটা শুরু হওয়ার আগেই বুঝে ফেলল, এক্ষুণি মরে যাবে সে। গলার ভিতরটা ফুলে উঠতে শুরু করল, গিঁঠ পাকিয়ে যাচ্ছে শ্বাসনালী। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শক্ত করে বাঁধা গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে গেল। চেতনা হারাচ্ছে সে দ্রুত। সারাশরীর ঝাঁকি খেতে শুরু করল। ভাঙা মেরুদণ্ডের হাড় ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে দিল কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ব্লাড ভেসেল, পেশি আর শিরা। ফুসফুসের অন্তত ছয়টা জায়গায় ফুটো করল ভাঙা পাঁজরের হাড়। জিভ বেরিয়ে এলো দাঁতের ফাঁক দিয়ে, পরক্ষণেই প্রবল মোচড় খেল শরীরটা। খট করে বাড়ি খেল দাঁতের সঙ্গে দাঁত। জিভটা কেটে টুপ করে খসে পড়ল নীচে। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বাঁধতে শুরু করল। শেষ কয়েকটা মুহূর্ত অসহ্য যন্ত্রণা পেল লোকটা, তারপর মিলল চিরমুক্তি।

মাথার উপর তাণ্ডব চলছে রুদ্র মেরু-ঝড়ের।

দুই

বাংলাদেশ। ঢাকা। মতিঝিল। বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

লিফট থামতেই করিডরে বের হয়ে এলো রানা। গতকাল নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছে ও। আজকেই জরুরি তলব করা হয়েছে,

তাই নিয়ম মাফিক জেট ল্যাগের ধকল সামলাবার জন্য দু'দিনের পূর্ণবিশ্রাম না নিয়েই ছুটে আসতে হয়েছে ওকে অফিসে।

প্রথমেই চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নাম এবং পদবী লেখা দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও অনুমতির তোয়াক্কা না করে।

'একমাত্র শালাটা এসেছে আমার,' ফাইল থেকে মুখ না তুলেই নিচু গলায় বলল সোহেল।

থমকে গেল রানা। ব্যাটা জানল কী করে কে ঢুকেছে!

জবাবটা সোহেলই দিল। 'করিডরে গোপন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। অফিস থেকে করিডর দেখা যায়।'

'কফি আনা।' চেয়ার টেনে বসল রানা, চট করে হাত বাড়িয়েও সামনে রাখা বেনসনের প্যাকেটটার দখল নিতে ব্যর্থ হলো। সাপের ছোবলের মত হাত চালাল সোহেল, বিদ্যুদ্বেগে ওটা তুলে নিয়ে কোটের পকেটে পুরে ফেলল। এই মাত্র ফাইল থেকে মুখ তুলেছে।

'নীলা,' গলা উঁচিয়ে ডাক দিল, যদিও আগেই টিপেছে বাযার।

জবাব দিল না কেউ। দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর ভিতরে ঢুকল সোহেলের সেক্রেটারি, লাল সিল্কের শাড়ি পরা অপরূপা নীলা। কপালে লাল টিপ। খোঁপা করা চুলের জন্য আরও সুন্দরী লাগছে দেখতে। হাতের ট্রেতে কফির সরঞ্জাম আর বিস্কিট।

'নীলা, নীলা,' আন্তরিক হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। 'সত্যি, দিন-দিন তুমি যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠছ! তোমার মনের দখল পেলে খুশিতে পাগল হয়ে যাবে যে-কোন পুরুষ।'

মুখ টিপে হাসল নীলা, চোখের নীরব ইশারায় সোহেলকে দেখিয়ে মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কই?'

'ও তো বহু আগেই পাগল ছিল, যাকে বলে বদ্ধ উন্মাদ!' নিষ্পাপ চেহারায় বন্ধুর হয়ে সাফাই গাইল রানা। 'নতুন করে হবে কী! আমি বলছি আমাদের মতো নওজোয়ানদের কথা। বুড়ো

হাবড়ারা বাদ।'

খেঁকিয়ে উঠল সোহেল, 'কফি খেয়ে বিদায় হলি তুই!'

রানার হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে ওর মুখটাও হাসি হাসি হওয়ার কথা, কিন্তু হয়নি।

রানা খেয়াল করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী, দোস্ত? বুড়োর হঠাৎ তলব?'

'হ্যাঁ।' থমথম করছে সোহেলের মুখ। 'কফি খেয়ে বাঘের মুখোমুখি হ গে যা, নিজেই জানতে পারবি। আমাকে ব্রিফ করতে নিষেধ করা হয়েছে।'

টিঁটটিঁটটিঁটটিঁটটিঁটটিঁট!

বেজে উঠেছে ইন্টারকম। সুইচটা অন করল সোহেল।

ভেসে এলো রাহাত খানের গুরুগম্ভীর গলা। 'সোহেল, রানা এসেছে?'

'জী, সার।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি, সার।'

কফিতে দুটো চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল রানা, ভ্রূ উঁচু করে কফির প্রশংসা নীলাকে জানিয়ে চলে এলো রিসেপশন রুমে। রানাকে দেখে লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁট টিপে হাসল ইলোরা, নেইল পলিশ করা সুন্দর আঙুলের ইশারায় পুরু সেগুন কাঠের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

দরজায় মৃদু টোকা দিল রানা।

'কাম ইন!' ভেসে এলো গম্ভীর গলা।

বুকের ভিতরে রক্ত ছলকে উঠল ওর। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, এই গলা শুনতে পাওয়ার জন্য মনটা কেমন যেন আকুলিবিকুলি করে ওর। কতোবার ও নিজেও বলতে পারবে না, মানুষটার নির্দেশে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। বাবার আদর-স্নেহ পায়নি ও কোনদিন, কিন্তু অন্তরে এই

বৃদ্ধের আপাত কঠোর মনোভাবের আড়ালে বহমান স্নিগ্ধ স্নেহের ফল্গুধারার স্পর্শ পেয়েছে ঠিকই। সেখানে কোনও খাদ নেই।

চট করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ফাইলে মুখ ডুবিয়ে আছেন বুড়ো বাঘ। 'বসো।' ফাইল থেকে চোখ না তুলেই চুরুট তাক করে একটা পেটমোটা ফাইল দেখালেন। ওটার উপরে লেখা: **প্রজেক্ট X-15.**

রাহাত খানের কপালের বামদিকে একটা শিরা তিরতির করে কাঁপছে, দেখল রানা।

চুরুট ধরালেন রাহাত খান। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন ওর মনের ভিতর কী চলছে তা পড়ছেন। 'মালয়েশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ যোগাযোগ করেছিলেন, রানা। মেজর জেনারেল হানিফ মহাম্মদ। একই সঙ্গে ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সে রিক্রুট হয়েছিলাম আমরা।' একটু থামলেন তিনি, মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'মালয়েশিয়ান একটা অ্যান্টার্কটিকা-ইন্সটলেশনে গোলমাল দেখা দিয়েছে। কদিন আগে তিনজন বিজ্ঞানী নিখোঁজ হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতিভাবান। তাঁদের মধ্যে বাঙালী আছেন দু'জন। এখন মনে হচ্ছে, মারাত্মক কিছু ঘটেছে ইন্সটলেশনের আর সবার ভাগ্যেও।'

চুপ করে থাকল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রাহাত খানের। 'ওখান থেকে শেষ খবর এসেছিল, ভাইরাস আরভিবিএ-র অ্যান্টিডোট খোয়া গেছে। মালয়েশিয়ান রেডিওম্যান ভুল করে ফেলেছিল। ওপেন চ্যানেলে খবরটা হেডকোয়ার্টারে দেয় সে। এরপর রিসার্চ ইন্সটলেশনের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করা যায়নি।

'ছত্রিশ ঘণ্টা আগে আবহাওয়া কিছুটা ভাল হওয়ায় বেস থেকে পাইলট আর একজন ক্রুকে ওখানে পাঠানো হয়। ইন্সটলেশনে কী ঘটেছে সেটা দেখে আসার নির্দেশ ছিল তাদের

ওপর। ফিরে আসেনি তারা। রেডিওতে ক্রুর শেষ কথা শোনা গেছে। চিৎকার করে সাহায্য চাইছিল। কথাও শেষ করতে পারেনি, মারা গেছে। তার আগে…আটচল্লিশ ঘণ্টা ইন্সটলেশনের সঙ্গে যোগাযোগের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।'

'সার্ভে করতে গিয়ে ক্রু ওপেন চ্যানেলে কথা বলছিল, সার? সবাই শুনতে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ। পরে আরেকটা হেলিকপ্টার পাঠায় মালয়েশিয়ান হেডকোয়ার্টার। নির্দেশ ছিল দূর থেকে ফটো তুলে আনার।'

সুইচ টিপলেন রাহাত খান। দেয়ালে একটা কন্সোল খুলে গেল, স্ক্রিনে দেখা গেল, কোথাও প্রাণের কোনও সাড়া নেই, ইন্সটলেশন থেকে অনেকটা দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা হেলিকপ্টার। 'ওটার দরজার কাছে পড়ে থাকা লাশটা পাইলটের। সামান্য দূরে ওই যে ক্রু। সবাই, বিশেষ করে পশ্চিমা-বিশ্ব…বোঝোই তো, আমেরিকা এর ব্যাখ্যা দাবি করেছে। কড়া ভাষায় মালয়েশিয়ানদের জানানো হয়েছে কী ঘটেছে সেটা কিছুই গোপন না করে প্রকাশ করতে হবে।

'অনেক দেশের গোয়েন্দা সংস্থাই মেসেজটা ইন্টারসেপ্ট করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনের প্রচণ্ড চাপ আসছে মালয়েশিয়ার ওপর। সবাই বুঝতে পারছে জেনেটিক গবেষণা আর অ্যান্টিডোট আবিষ্কারের আড়ালে আসলে গোপনে মারাত্মক কোন বায়োলজিকাল উইপন তৈরি করছিল মালয়েশিয়া। পরাশক্তিগুলোর চাপে তাদের কয়েকজন বিজ্ঞানী আর ডাক্তারকে নিয়ে একটা যৌথ তদন্ত কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়েছে মালয়েশিয়া।'

ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে রানার দিকে তাকালেন বিসিআই চীফ।

'আসলে ভাইরাস আরভিবিএ-র কোনও অ্যান্টিডোট ছিল না, রানা। চুরি হয়েছে ভাইরাসটাই। পশ্চিমা বিশ্বের তৈরি ফর্মুলা। অনেক হাত ঘুরে মালয়েশিয়ার হাতে এসেছিল। ওদের সিক্রেট

সার্ভিস চীফ অনুরোধ করেছেন আমাদের সেরা এজেন্টদের মধ্যে থেকে কাউকে যাতে পাঠানো হয়।' বাড়ল রাহাত খানের ভ্রূ কুঞ্চন। সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি, মনে হলো রানা কিছু বলবে সেই অপেক্ষায় আছেন।

'আমাদের দায়িত্ব কী হবে, সার?'

'সীমাহীন ক্ষমতা থাকবে আমাদের এজেন্টের। প্রয়োজনে সবাইকে খুন করে হলেও মালয়েশিয়া যে বায়োলজিকাল উইপন তৈরি করছিল সে-তথ্য গোপন করবার ব্যবস্থা নিতে হবে তাকে। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই কোন প্রমাণ রাখা চলবে না যে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীরা তাদের সাহায্য করছিলেন।'

কথা থামিয়ে আরেকটা সুইচে টিপ দিলেন তিনি। রানার পিছনে দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকলেন বিসিআইয়ের টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট হেড, উইপন এক্সপার্ট পাগলাটে বিজ্ঞানী শামশের আলী। একটা কথাও বললেন না ভদ্রলোক, রাহাত খানের দিকে তাকালেন না, ভিখারি যেভাবে ভিক্ষা চায়, ঠিক তেমনি করে খানিকটা ঝুঁকে রানার সামনে হাত পাতলেন।

'তোমার অস্ত্রটা দাও ওঁকে,' বললেন রাহাত খান।

ক্ষ্যাপাটে বিজ্ঞানীকে দেখে নিয়ে হোলস্টার থেকে ওয়ালথার প্পিপিকে বের করে দিল রানা।

মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করলেন শামশের আলী, আফসোস করে মাথা নাড়লেন। 'হবে না। কিচ্ছু হবে না এটা দিয়ে।'

'আরেকটা পিস্তল লাগবে?' গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিসিআই চীফ।

মিনমিন করে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল রানা, নিজের হাতের বাড়তি অংশ মনে করে ও ওয়ালথার পিপিকেটাকে, কিন্তু আস্তে করে মাথা নাড়লেন বিজ্ঞানী। 'খুবই দুঃখজনক এটার পারফর্মেন্স

তবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো করে দেয়া যাবে। তেলের বদলে গ্র্যাফাইট লাগবে। কয়েকটা স্প্রিং আর ছোট স্লাইডও বদলানো দরকার।'

'কাজটা দুপুরের আগে হলে ভাল হয়,' বললেন মেজর জেনারেল।

বিজ্ঞানী অস্ত্রটা নিয়ে অসন্তুষ্ট চেহারায় চলে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকালেন তিনি। রানা লক্ষ করল, কপালের সেই শিরাটা এখনও তিরতির করে লাফাচ্ছে।

'আমাদের বিজ্ঞানীরা পশ্চিমা বিশ্বের তৈরি ভয়ঙ্কর একটা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছিল, রানা। অ্যান্টিডোট তৈরির চেষ্টা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে ছিল জেনেটিক রিসার্চ। মিলিটারি পারপাসে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের উৎকর্ষ সাধনের কাজও করা হচ্ছিল ওখানে, মালয়েশিয়ার সহায়তায়। আমাদের সেরা বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করা হয়েছিল ওখানে। কাজটা এতোই বিপজ্জনক ছিল যে অ্যান্টার্কটিকায় গবেষণা না করে উপায় ছিল না।'

'ওখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে লোকক্ষয় কম হবে, এজন্যে?'

রানার এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না বৃদ্ধ।

'তোমার কাভার, জেনেটিক বিজ্ঞানী। প্রয়োজনীয় বই-পত্র সোহেলের কাছেই পেয়ে যাবে। যাবার আগে চোখ বুলিয়ে নিয়ো। ওতে তেমন কোনও সমস্যা হবে বলে মনে করি না।'

'কখন রওনা হবো আমি, সার?'

'বিকেলে। এয়ারফোর্সের প্লেনে করে প্রথমে মালয়েশিয়া, তারপর সেখান থেকে মালয়েশিয়ান প্লেনে করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ভিক্টোরিয়া ল্যান্ড, সবশেষে ম্যাকমার্ডো সাউন্ড পেরিয়ে মালয়েশিয়ান হেডকোয়ার্টারে।'

'বিজ্ঞানীরা আমার ব্যাপারে কী জানেন, সার?'

'তুমি জেনেটিক সায়েন্সে ডক্টরেট করা কর্নেল মাসুদ রানা,

মালয়েশিয়ান যৌথ বাহিনীর স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর মালয়েশিয়ান বেসে আর্মি কর্নেল তিব্বত মাহমুদের সঙ্গে দেখা করবে। সে-ই ওখানে দায়িত্বে আছে। সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'সে-ও কি জানবে আমি মালয়েশিয়ান যৌথ-বাহিনীর ইন-ভেস্টিগেটর?'

'হ্যাঁ।' সামনের ফাইলে চোখ নামালেন তিনি। 'ফাইলটা অফিসে গিয়ে পড়ে নিয়ো।'

অর্থাৎ, এবার বিদায় হও।

পিছনে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, ইলোরাকে নিজের সেরা মেয়ে-পটানো হাসিটা উপহার দিয়ে সোহেলের ঘর হয়ে চলে এলো নিজের অফিসে, মন দিল ফাইলে। কখন দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বলতেও পারবে না।

চটকা ভাঙল দরজা খুলবার শব্দে, বায়োলজির বইটা চট করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তেলতেলে হাসি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন পাগলাটে বিজ্ঞানী শামশের আলী, স্পষ্ট বুঝল রানা, মতলব আছে প্রতিভাবান পাগলের।

'আমার টিভি সেটে দেখলাম এ-ঘরে আছেন, তাই এখানেই চলে এলাম।' প্যাকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করলেন তিনি, রানা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই চট করে অস্ত্রটা সরিয়ে নিলেন। 'প্রতিটা পার্ট থেকে তেল দূর করে গ্র্যাফাইট দিয়ে দিয়েছি। নাজুক পার্টগুলো ঠিক করেছি। শূন্যের নীচে ফিফটি বা সিক্সটি ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও এখন কাজ করবে এটা। আগে হলে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ে যেত। তেল জমে যেত, তার চাপে ছোট যন্ত্রাংশগুলো ভাঙত।' চকচক করছে বুড়োর চোখ জোড়া। 'তারচেয়ে অনেক ভাল হয় আমার তৈরি...'

অস্ত্রটা একরকম ছিনিয়েই নিতে হলো রানাকে।

'ধন্যবাদ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রানার চেহারার দিকে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো

তাকিয়ে থাকলেন বিজ্ঞানী, তারপর বললেন, 'আপনি ফেরবার পর নতুন অস্ত্রের ব্যাপারে কথা বলব আমরা, কেমন? এসব পুরোনো মাল ব্যবহার করা ভাল কথা নয়। আমার তৈরি এস. এ. গান, যেটা দিয়ে পনেরোশো গজ দূর থেকে...'

'আর যদি ম্যালফাঙ্কশান করে? যদি মারা পড়ি?'

এক মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন শামশের আলী, তারপর বললেন, 'তা হলে আর কাউকে দেব জিনিসটা আরও ইমপ্রুভ করে।'

মধুর হাসি হাসল রানা। 'এ-যাত্রা বেঁচে ফিরে আসতে পারলে পরে একসময় আপনার যন্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখব, মিস্টার আলী, প্রমিজ।'

'অ্যাঁ?' কড়া চোখে রানাকে দেখলেন বিজ্ঞানী। "যন্ত্র" বলতে রানা আবার অন্য কিছুর ইঙ্গিত করল কি না ভাবছেন। রানার মুখ দেখে টের পাওয়া গেল না কিছুই। গম্ভীর, অসন্তুষ্ট মুখে নিজের আস্তানা ল্যাবোরেটরিতে ফিরে গেলেন তিনি নিচু স্বরে কী সব বিড়বিড় করতে করতে।

বায়োলজির বিটকেল মোটা বইয়ে আবার নাক গুঁজল রানা। কেমিস্ট্রি এখনও বাকি!

মালয়েশিয়ান এয়ারপোর্টে বিশেষ প্লেনে উঠতেই পাইলট পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর ক্রুদের সঙ্গে। আন্তরিকতা দেখিয়ে হাত মেলাল সবাই।

ডক্টর রাবিতা আশরাফ আগেই চলে এসেছে। মালয়েশিয়ার তরফ থেকে রানার সহকারী বিজ্ঞানী হিসাবে যাচ্ছে সে। পরিচয় হলো তার সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই রানা বুঝে গেল, বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি না হলেও এর মাথায় ঘুরছে হরেক জটিল সমস্যা। সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়েই হয়তো সে মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর। দায়সারা ভাবে পরিচয়ের পালা চুকিয়ে ফেলল কৃষ্ণ-নয়না সুন্দরী,

দ্বিতীয়বার আর রানার দিকে তাকালই না একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনে চোখ, যদিও ওটা পড়ছে বলে মনে হলো না।

গোটা যাত্রায় একটা কথাও হলো না রানার সঙ্গে তার। নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণে ডুনেডিন শহরে নামল প্লেন। এখান থেকে অন্য একটা উড়োজাহাজে যেতে হবে অ্যান্টার্কটিকায়।

অপেক্ষা করছিলেন মালয়েশিয়ান এয়ারফোর্সের একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, রানা ও রাবিতা কাস্টোমস পেরোনোর পর অভ্যর্থনা জানালেন। অল্পবয়েসী, হাসিখুশি মানুষ। পথ দেখালেন।

'এবার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ডক্টর রাবিতা আর আমি, আমরা দু'জনই ক্লান্ত।'

'আমাকে আবিদ বলেই ডাকবেন, কর্নেল রানা,' বললেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। 'সবাই তা-ই ডাকে।'

ভ্রূ কুঁচকে তাঁকে দেখল ডক্টর রাবিতা। গাড়িতে উঠে বলল, 'প্রথমে গোসল দরকার আমার। তারপর বিশ্রাম।'

ড্রাইভিং সিট থেকে ঘাড় ফিরালেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, মুখটা এখনও হাসি-হাসি। 'দুঃখিত, ডক্টর। ট্র্যান্সপোর্ট এয়ারক্র্যাফটে আপনাদের একটা করে সিট দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। খাওয়া হিসেবে প্রচুর ঝাঁকির সঙ্গে পাবেন এক বাক্স লাঞ্চ। ব্যস!'

মহাবিরক্ত চেহারায় কী যেন বলতে যাচ্ছিল রাবিতা, রানা আগেই মুখ খুঁলল। 'আমরা কি এখনই রওনা হচ্ছি?'

'জী, কর্নেল। আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আবহাওয়া এখন ভাল। তবে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে বেশিক্ষণ ভাল থাকবে না। এখন রওনা হতে না পারলে হয়তো আগামী দু'সপ্তাহেও যেতে পারবেন না।'

খিদেয় পেট জ্বলছে রানার। 'বাক্সের লাঞ্চটা কেমন?' জিজ্ঞেস করল।

'ভয়ঙ্কর, সার,' আন্তরিক হাসলেন আবিদ হাসান, 'সত্যিই ভয়ঙ্কর।' গাড়িটা বাঁক নিল, টার্মিনাল বিল্ডিং পিছনে ফেলে একটা রানওয়ে পার হয়ে মাঠের দিকে চলেছে।

আড়চোখে মিস রাবিতাকে দেখল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। নিজের চিন্তায় মগ্ন। দীর্ঘ যাত্রায় কথা তো বলেইনি, রানার মনে হয়েছে প্রতিটা মুহূর্ত নিজেকে সরিয়ে রাখতে গিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

শেষ দফার মালামাল তোলা হচ্ছে বিরাট হ্যাঙ্গারের সামনে রাখা পেটমোটা হারকিউলিস সি-১৩০ ট্র্যান্সপোর্ট বিমানে। ফিউজিলাজ আর লেজে মালয়েশিয়ান এয়ারফোর্সের মার্কিং। তবে আধডজন লোক যারা ঝাড়া মোছার কাজ করছে তাদের পরনে সিভিলিয়ান পোশাক।

'এবার শীতটা তাড়াতাড়ি পড়ে গেছে, কর্নেল,' বললেন আবিদ হাসান। 'সাপ্লাই ঘাটতি দেখা দেবে আমরা শীঘ্রি না গেলে।'

'আমি ওটায় উঠব না,' চোখ সরু করে বিদঘুটে চেহারার হারকিউলিসটাকে দেখল রাবিতা।

রিয়ারভিউ মিররে তাকে দেখলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। 'দুঃখিত, কিন্তু গেলে ওটাতে করেই যেতে হবে। যাবেন কি যাবেন না সেটা অবশ্য আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি রাশান ডেলিগেশনের সঙ্গে যাব, তাদের প্লেন অন্তত...'

'ভুলে যান, আবিদ সাহেব,' রাবিতার মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'আমরা কিছু শুনিনি।'

'ঝড়ো বাতাস, কী বলেন, সার?' হাসলেন আবিদ হাসান। 'কী শুনতে যে কী শুনেছি!'

গাড়ি থামবার পর নেভির পার্কা পরা এক লোক এগিয়ে এলো। রানা নামতেই স্যালিউট করে হাত বাড়িয়ে দিল। 'কর্নেল রানা?'

'হ্যাঁ।' স্যালিউটের জবাব দিয়ে হাত মেলাল রানা।

'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেহান।' হারকিউলিস দেখালেন। 'ওটার পাইলট।'

গাড়ি থেকে নেমেছে রাবিতা। হাত বাড়িয়ে দিলেন রেহান। 'ডক্টর রাবিতা?'

হাতটা না দেখবার ভান করল রাবিতা। 'রওনা হওয়ার আগে আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

'সম্ভব নয়, ডক্টর,' বললেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। 'আমরা এখনই রওনা হবো।'

'আমাকে ফোন করতেই হবে,' জ্বলে উঠল মহিলা বিজ্ঞানীর চোখ। পা ঠুকল সিমেন্টের মেঝেতে।

'পরে হবে,' একটু কড়া শোনাল রানার গলা। বুঝতে পারছে এখনই রাশ টেনে না ধরলে পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করবে এই মেয়ে। আবিদ হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাবিতার কনুই ধরল। মেয়েলি বাধা অগ্রাহ্য করে প্লেনের দিকে এগোল ও, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেহানকে জিজ্ঞেস করল, 'লাঞ্চ বক্সের কী হবে? ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হাসানের কাছে শুনলাম ওগুলোর গুণাগুণ। সত্যিই অতোটা?'

'কমই বলেছে ও,' হাসলেন লেফটেন্যান্ট রেহান।

র‍্যাম্প বেয়ে প্লেনের ভিতর ঢুকল ওরা, মালামালের বাক্স এড়িয়ে এগোল। ন্যাভিগেটরের যন্ত্রপাতির পিছনে চওড়া ডেকে তাড়াহুড়ো করে পাশাপাশি দুটো জাম্প সিট বসানো হয়েছে। ওগুলো দেখালেন রেহান। রানা আর রাবিতাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ক্রুদের ডাকছি। রওনা হয়ে যাব।'

রানার পাশে বসল রাবিতা, মুখটা থমথম করছে। নীরবে সিটবেল্ট বেঁধে নিল। বুঝতে পারছে রানা, মেয়েটাকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়া দরকার। তাতে যদি সম্পর্কটা আরও আড়ষ্ট হয়, হোক।

'মিস আশরাফ,' গম্ভীর চেহারায় শুরু করল ও। 'আপনাকে আগেই ব্রিফ করা হয়েছে। তবু আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি। আমাদের ইন্সটলেশনের সাতাশজন লোক সম্ভবত মারা গেছে। হেলিকপ্টার পাইলট আর ক্রুও রেহাই পায়নি। ওখানে কী ধরনের কাজ হচ্ছিল সেটা আপনি ভাল করেই জানেন। জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাকে বিশ্বাস করেছে আপনার দেশ। আরও কয়েকটা দেশের বিজ্ঞানী আর ডাক্তাররাও যাচ্ছেন ওখানে তদন্ত করতে। আমাদের স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর এমন কিছু দেখলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন আপনি।'

চুপ করে থাকল রাবিতা। কিন্তু সুন্দর কোমল চেহারায় নানা অনুভূতির দোলা দেখল রানা। মেয়েটাকে একটা লাঞ্চের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা সদ্ব্যবহার শুরু করে দিল ও।

ক্রুদের নিয়ে চলে এসেছেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেহান, ককপিটে ঢুকবার আগে রানার সামনে থামলেন। 'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হাসানকে তো চেনেন, কর্নেল। ও আমাদের এই প্রমোদ-ভ্রমণের ন্যাভিগেটর। আর কুৎসিত চেহারার এই ছোকরাটাকে যে দেখছেন, এর নাম আমির ইলাহি।'

'কর্নেল রানা,' একগাল হেসে হাত মিলাল সুদর্শন ইলাহি। 'আমাকে আমির বলেই ডাকবেন। ওতে নিজেকে আমার রাজা-বাদশা বলে মনে হবে।'

চট করে কো-পাইলটের সিটে বসে পড়ল সে রাবিতাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে।

ন্যাভিগেটরের সিটে বসলেন আবিদ হাসান, হেডফোন লাগিয়ে নিলেন কানে, তারপর প্রজাপতির মতো বিভিন্ন সুইচে আঙুল নেচে বেড়াতে লাগল তাঁর।

'স্টপ সাইনে শার্প লেফট, তারপর পোস্ট অফিস পার হয়ে সোজা দৌড়।'

'ঠিক আছে,' বললেন রেহান। গুরুগম্ভীর গর্জন ছেড়ে একটা

একটা করে স্টার্ট নিল হারকিউলিসের ভারী ইঞ্জিনগুলো। চাকা গড়াতে শুরু করল।

আবিদ হাসান রানার দিকে তাকালেন। 'সাউন্ড পর্যন্ত দু'হাজার মাইল। প্রায় সাতঘণ্টা লাগবে। কিছু যদি খেতে চান তো কোনা ঘুরলেই পেয়ে যাবেন। ওখানে লাঞ্চ বার।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল রানা। লাঞ্চ শেষ করেছে। 'আগে ঘুম দরকার।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আমির ইলাহি। 'যদি ঘুমাতে পারেন তা হলে আমি নিজের পকেটের পয়সায় আপনাকে ডিনার খাওয়াব, সার। যা খেতে চান।'

'বেশ,' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল রানা। চোখ বুজল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

তিরিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে ছুটছে তখন হারকিউলিস।

'গলদা চিংড়ির রোস্ট, সেই সঙ্গে চাওমিং,' চারঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে উঠে বলল রানা।

ঘাড় ফিরালেন আবিদ হাসান। 'স্লীপিং বিউটি জেগে গেছেন।'

আমির ইলাহি রানার দিকে তাকাল। 'ভান করছিলেন, তাই না, কর্নেল?'

'না।'

'যাহ্, গেল আমার বেতনের আদ্ধেক!' বিড়বিড় করল ইলাহি।

পাশের সিটে রাবিতা নেই। 'মিস আশরাফ কোথায়?' সিটবেল্ট খুলল ও।

আবিদ হাসান বললেন, 'পাউডার রূমে গেছেন।'

'সিগারেট খাওয়া যাবে?' উঠে দাঁড়াল রানা।

'নিশ্চয়ই, কর্নেল!' অটোপাইলট অন করলেন লেফটেন্যান্ট রেহান। 'আর কফি যদি চান তো খেয়ে নিন। বিশ মিনিট সময়

পাবেন, তারপরই শুরু হবে ঝাঁকি।'

উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। নীচে কালো সাগর, তার গায়ে এখানে ওখানে সাদা সাদা দাগ—হিমশৈল—ভাসছে। সামনের দিকে ধূসর একটা দেয়াল, নীচ থেকে শুরু করে আকাশ ছুঁয়েছে। ওপারে কী আছে দেখা যায় না।

'আজ খবর করে ছাড়বে আমাদের,' জানালেন লেফটেন্যান্ট রেহান। 'ওখানে যাওয়া খুব জরুরি না হলে ফিরে যেতাম। কফিটা খেয়ে নিন। আর বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপরই মনে হবে বোতলের ভেতর ভরে ইচ্ছেমতো ঝাঁকাচ্ছে।'

গ্যালিতে চলে এলো রানা, দেখল বাল্কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাবিতা, হাতে কফির কাপ। বড় বড় চোখ করে কালো কফির দিকে তাকিয়ে আছে। ফরসা মুখটা ফ্যাকাসে, মনে হচ্ছে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। রানাকে দেখে হাসবার চেষ্টা করল।

'কোন অসুবিধে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল রাবিতা। 'ভয়।'

'তা হলে সাউন্ডেই থেকে যেতে পারেন। ইন্সটলেশনে যেতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।'

'না, ওজন্যে নয়। আমি জীবনে কখনও অ্যারোপ্লেনে চড়িনি।'

'ও!' রানা বুঝতে পারছে মেয়েটার অনুভূতি।

'ওরা বলাবলি করছিল ঝড় আসছে,' ঠোঁট কাঁপছে মেয়েটার। চেহারা দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবে।

মালয়েশিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত মনের জোর খাটিয়ে নিজেকে ধরে রেখেছে মেয়েটা। কথা বলেনি দাম দেখাবার জন্য নয়, আতঙ্ক চাপতে গিয়ে!

'কফিটা খেয়ে নিন,' বলল রানা। 'ফিরে গিয়ে সিটবেল্ট বাঁধতে হবে। একটু ঝাঁকি লাগতে পারে।'

'আ...আমি...'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা। 'প্লেন যারা চালাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই এক্সপার্ট। বহুবার গেছে সাউডে। নিশ্চিন্তে থাকুন, দুর্ঘটনার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন।'

চেহারা দেখে মনে হলো রানার কথা বিশ্বাস করতে চাইছে মেয়েটা, কিন্তু ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মৃদু-মৃদু কাঁপছে নীচের ঠোঁট।

'এক মিনিট, দাঁড়ান।' ককপিটে চলে এলো রানা, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেহানকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল।

'ফার্স্ট এইড কিটে ট্র্যাঙ্কুইলাইযার আছে,' জানালেন রেহান।

আবিদ হাসান ট্যাবলেটের স্ট্রিপ বের করে দিলেন। ওগুলো নিয়ে রাবিতার কাছে ফিরে এলো রানা। 'এগুলো থেকে দুটো খেয়ে নিন, ভাল লাগবে।'

বাধ্য শিশুর মতো কথা শুনল রাবিতা, কফি দিয়ে দুটো ট্যাবলেট গিলে নিল। রানার দু'নম্বর সিগারেটটা শেষ হতে হতে মেয়েটার চোখে বেশ একটা স্বপ্নিল ভাব দেখা দিল।

কফির খালি কাপ হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রাবিতা। কাগজের কাপটা নিয়ে ট্র্যাশ ক্যানে ফেলে দিল রানা, কনুই ধরে রাবিতাকে নিয়ে সিটের দিকে ফিরে চলল। দু'পা বাড়বার আগেই এয়ারপকেটে পড়ে প্রথম ঝাঁকিটা খেল হারকিউলিস। রানার গায়ে ঢলে পড়ল রাবিতা, সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মুহূর্তের জন্য, তারপর দেহ এলিয়ে দিল। শক্ত করে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল রানার গলা। বুকে নরম স্পর্শ পেল রানা।

'ধরে থাকুন, প্লিইজ!' ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল রাবিতার কণ্ঠ। চোখ বুজে আছে। 'ছাড়বেন না।'

'সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন,' ফ্লাইট ডেক থেকে তাগাদার সুরে নির্দেশ দিলেন লেফটেন্যান্ট রেহান।

রাবিতাকে বসিয়ে শক্ত করে সিটবেল্ট বেঁধে দিল রানা, নিজেরটাও বেঁধে নিল।

বাইরে এখন ঘোলাটে সাদা ঘূর্ণি ছাড়া দেখবার কিছু নেই। অ্যান্টার্কটিকার ঝড়ের ভিতরে নাক গুঁজে দিয়েছে সি-১৩০, ঝাঁকি খেতে খেতে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে সামনে।

সর্বক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাবিতা, ঠোঁটে বোকার হাসি।

ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের ওপাশে মালয়েশিয়ান বেস ক্যাম্পের ইন্সটলেশনটা গোটা কয়েক ছড়ানো ছিটানো বাড়ি, রেডিও টাওয়ার, স্যাটেলাইট ডিশ আর সাপ্লাই ডাম্পের সমন্বয়। যে-কোনদিকে যতোদূর চোখ যায়, তুষার আর বরফে ছাওয়া ধু-ধু বিরান প্রান্তর ছাড়া আর কিছু নেই। ক্যাম্পের এখানে-ওখানে তুষার জমিয়ে উঁচু সব স্তূপ করে রাখা হয়েছে। ল্যান্ডিঙের সময় রানা খেয়াল করল রানওয়েটা পরিষ্কার করা হয়েছে। ঝড় বয়ে যাওয়ার পর লোকজন এখন ব্যস্ত হাতে কাজ সারছে।

দুপুর মাত্র দুটো বাজে, কিন্তু এখনই সন্ধ্যার আঁধার ঘনাতে শুরু করেছে। টাচডাউন করল হারকিউলিস, রানওয়ের শেষমাথায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ট্যাক্সিইং করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর সাপ্লাই এলাকার দিকে চলল। ক্যাম্পে এমন হ্যাঙ্গার নেই যে বিরাট প্লেনটাকে ভিতরে রাখা যাবে। খোলা জায়গায় রাখতে হবে ওটাকে।

'এক তলার বেশি কিছু তৈরি করা যায় না বাতাসের জন্যে,' ব্যাখ্যা করলেন রেহান। 'সারাবছর বাতাসের বেগ থাকে ঘণ্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল। ঝড় হলে দমকা হাওয়া বাদ দিয়েও পরীক্ষা করে দেখা গেছে টানা বাতাসের গতি হয় একশো মাইল। মাঝে মাঝে বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি রেডিও টাওয়ার দাঁড় করিয়ে রাখাও দুরূহ হয়ে যায়

রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরল হারকিউলিস, থামল তারপর। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট রেহান আর আমির ইলাহি কয়েকটা সুইচ টিপলেন,

গুঙিয়ে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিনগুলো।

'ওয়েলকাম টু দি অ্যান্টার্কটিকা,' পাইলটের সিট থেকে উঠতে উঠতে বললেন রেহান।

'আবারও আমরা হারিয়ে না গিয়ে ঠিক জায়গায় আসতে পেরেছি,' হাসলেন আবিদ হাসান।

'ওটা স্রেফ কপালের জোর, সার,' মন্তব্য করল আমির ইলাহি।

টেনশন কেটে গেছে। হাসল সবাই, রাবিতা ছাড়া। ঘুমের ওষুধের প্রভাব এখনও কাটেনি তার।

রাবিতার সিটবেল্ট খুলে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। আমির ইলাহি ইতিমধ্যেই ভারী বুট, পার্কা, আর পুরু মিটেন নিয়ে এসেছে।

'পরে নিন ' বাড়িয়ে দিল জিনিসগুলো।

জানালা বাইরে তাকাল রানা। কাছের বাড়িটার দূরত্ব একশো গজের বেশি হবে না। কিন্তু ও-পর্যন্ত গরম কাপড় ছাড়া যাওয়া অসম্ভব। বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে ষাট ডিগ্রি। রাবিতাকে পার্কা পরতে সাহায্য করল ও, নিজেও পরে নিল। সবাই তৈরি হয়ে নেওয়ার পর খোলা হলো রিয়ার কার্গো ডোর। বরফ-শীতল বাতাসের ছ্যাঁকার কারণে মনে হলো যেন শ্বাস আটকে যাবে।

ভারী পোশাক পরা পার্সোনেলরা এগিয়ে আসছে তাদের শীতকালীন সাপ্লাই নিতে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং পর্যন্ত যেতে যেতে নাক-মুখ জ্বলে উঠল রানার। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, চোখের সঙ্গী হয়েছে নাকও। পা দুটো মনে হলো জমে যাচ্ছে।

ইন্সটলেশনের নার্স অসুস্থ রাবিতার দায়িত্ব নিল। লেফটেন্যান্ট রেহান সদলবলে চলে গেলেন রিপোর্ট দিতে। রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হলো কর্নেল তিব্বত মাহমুদের অফিসে।

ষাঁড়ের মতো আকৃতি কর্নেলের, উচ্চতায় ছয় ফুট সাতের কম

হবেন না। ফুলে থাকা কালো চুলের কারণে মাথাটা বিরাট দেখাচ্ছে। দাড়িতে পাক ধরেছে দু'এক জায়গায়।

ছোট্ট অফিসটা ভরে আছে বই, ম্যাপ আর মালয়েশিয়ান সুন্দরী নায়িকাদের সহাস্য ছবিতে। উষ্ণ সৈকতে রৌদ্রস্নান করছে তারা।

পরিচয়ের পালা চুকবার পর পার্কা খুলে ডেস্কের সামনে বসল রানা, কর্নেলের বাড়িয়ে ধরা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল। লাইটার বাড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন কর্নেল, নিজেও একটা ধরালেন। রানাকে ভাল মতো দেখা হয়ে গেছে তাঁর। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে রানার সামনে একটা গ্লাস রাখলেন।

'এই বয়সেই কর্নেল?' প্রশংসা করে মৃদু হাসলেন তিনি। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন, 'শুনলাম মিস রাবিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'প্লেনে উঠতে ভয় পান উনি। ট্র্যাঙ্কুইলাইযার দেয়া হয়েছিল।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল কর্নেলের। 'ঠিক সময় মতো সেরে উঠবেন তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমরা ইন্সটলেশনে যাচ্ছি কখন?'

'আগামীকাল কোনও এক সময়। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা তাদের বেসে পৌঁছে গেছে। আজই এখানে এসে পড়বে। কাল সকালে ব্রিফিং, তারপরই রওনা হওয়া যায়।'

'কী ঘটেছিল ওখানে, কর্নেল? নতুন কিছু জানা গেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিব্বত মাহমুদ। 'না। তবে জানতে পারলে ভাল হতো। ওখানে না গিয়ে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই।'

'হেলিকপ্টারের পাইলট আর ক্রুর পরিণতি জেনে মনে হচ্ছে যাওয়ার আগে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে।'

'নিশ্চয়ই! এবার সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেব আমরা।...আচ্ছা, কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা কে বা কারা তা জানেন তো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

'আমাদের লোক ছাড়া থাকছে একজন আমেরিকান, রাশান একজন, একজন ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ একজন, একজন চাইনিজ, একজন জার্মান বিজ্ঞানী আর একজন ভারতীয়। সবার চোখ ফাঁকি দেয়া কঠিন হবে আমাদের জন্যে।'

'আমার কাজ কি তা তো জানেন,' গ্লাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা, গরম তরলটুকু গলা দিয়ে নেমে যেতে দিয়ে বলল, 'আপনার সাহায্য-দরকার হবে আমার।'

'যা বলেন। আমাকে ওপর থেকে নির্দেশ দেয়া আছে।'

'যে সাতাশজন মারা গেছে বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে নিজে আলাদা ভাবে গবেষণা করছিল?'

জবাব দেওয়ার আগে একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন কর্নেল। 'বলা যায় না। এখানে যারা দীর্ঘদিন থাকে তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই বিরূপ পরিবেশের কারণে মারাত্মক মানসিক চাপ পড়ে। ঝগড়াঝাঁটি হয় না তা-ও না। বিকেলে রিক্রিয়েশন হলে টেবল-টেনিস ছাড়া বিনোদনের আর কোন উপায় নেই। আমি জানি না কী ঘটেছিল, কেন চুপ হয়ে গেছে তারা। কারও ব্যক্তিগত গবেষণার কথা আমাদের জানা নেই।'

'আর কী ঘটতে পারে? স্যাবোটাজ?'

'মনে হয় না। প্রত্যেকেই ছিল দেশপ্রেমিক। তদন্ত করে বেছে বের করা হয়েছিল সবাইকে।'

উঠল রানা। 'আপাতত আমার আর কিছু জানার নেই।'

'ঠিক আছে।' কর্নেলও উঠলেন। 'আসুন, খেয়ে নিন। তারপর আপনাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দেব। আগামী কয়েকদিন আর বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবেন না হয়তো।'

বাড়িগুলো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে আনহিটেড সুড়ঙ্গ দিয়ে যুক্ত। রানাকে ঘুরিয়ে দেখালেন কর্নেল। শীতের কাপড় ইস্যু

করা হলো রানার জন্য। মেস হলে একসঙ্গে খাওয়া সারল ওরা, তারপর ওকে পৌঁছে দেওয়া হলো শোবার ঘরে। ছোট্ট একটা খুপরি বললেই চলে। আসবাবপত্র বলতে একটা চৌকি, ড্রেসার আর ছোট একটা ক্লজিট। ঘরের একমাত্র জানালাটা দিয়ে বাইরের হিমশীতল বরফের রাজ্য দেখা যাচ্ছে।

'ডক্টর রাবিতা পাশের ঘরে,' জানালেন কর্নেল। 'ঘুমাচ্ছেন।'

বিদায় নিলেন কর্নেল। বিছানার দিকে তাকাল রানা। কম্বল আর বালিশ দেখে মনে হলো অনেকদিন ওর শোওয়া হয় না। তবু একবার চট করে পাশের ঘরে গিয়ে রাবিতাকে দেখে এলো। নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে মেয়েটা। এবার এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমাতে দু'মিনিটও লাগল না ওর।

তিন

রানার ঘুমটা ভাঙল হঠাৎ করে। বাইরে, বিল্ডিঙে বাড়ি খেয়ে একটানা গোঙাচ্ছে শীতল ঝড়ো হাওয়া। চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে বাতাসের আওয়াজ শুনল ও, কান খাড়া করে রেখেছে অন্য অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনা যায় কি না সেজন্য।

বামহাত তুলল চোখের সামনে। বিসিআইয়ের বিজ্ঞানী শামশের আলীর দেওয়া রিস্টওয়াচের লুমিনাস ডায়াল অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। দুটো বেজে বারো মিনিট। ইন্সটলেশনের প্রায় সবার এখন ঘুমানোর কথা। রেডিও অপারেটর হয়তো জেগে থাকবে। আর জেগে থাকতে পারেন দু'একজন নিবেদিতপ্রাণ

পাগলাটে বিজ্ঞানী, রাতেও যাঁদের গবেষণার থামাথামি নেই।

আবার হলো শব্দটা। চট করে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল রানা বিছানায়। আওয়াজটা শুনে মনে হলো ব্যথায় অস্ফুট চিৎকার করেছে কেউ। যেন বুনো কোন জন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে উঠেছে।

বিছানা থেকে নামল রানা, খালি পায়ে ছ্যাঁকা দিল বরফ-ঠাণ্ডা মেঝে। বালিশের নীচ থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে নিঃশব্দে পা বাড়াল ও দরজার দিকে। থামল দরজার সামনে, গভীর মনোযোগে শুনবার চেষ্টা করল।

আবার হলো আওয়াজটা, ডক্টর রাবিতার ঘর থেকে আসছে! রাবিতারই গলা, মনে হলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

চট করে কাপড় পরে নিয়ে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা। কমিশনে কারা আছে জানবার পর থেকেই অস্বস্তি বোধ করছে ও, সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে। ঘুমটা সেজন্যই গাঢ় হয়নি, রাবিতার কান্নার সামান্য শব্দে ভেঙে গেছে।

মেয়েটার জন্য দুঃখই হলো ওর। কঠিন একটা সময় যাচ্ছে রাবিতার। কমিশনের সঙ্গে তাকে যদি কাজ করতে হয় তা হলে নিজেকে সামলে নিতে হবে, নইলে বিপক্ষ দলের লোকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ওর মাধ্যমে অনেক কিছুই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

করিডরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। নিজের শ্বাস দেখতে পাচ্ছে রানা। একবার ভাবল বুট পরে আসে, তারপর সিদ্ধান্ত নিল তার দরকার নেই। দু'এক মিনিটের বেশি লাগবে না রাবিতার ঘর থেকে ঘুরে আসতে। মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে চট করে ফিরে যেতে হবে নিজের ঘরে, ঘুম না হলেই নয়। দরজায় কান পাতল রানা। কাঁদছে রাবিতা। দরজায় টোকা দিতে যাচ্ছিল রানা, আরেকটা আওয়াজ পেয়ে বরফের মতো জমে গেল।

ঘরে আরও কেউ আছে রাবিতার সঙ্গে। নিচু গলার একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। কী বলা হয়েছে বুঝতে পারেনি,

তবে গলাটা পুরুষের।

দরজার নবে মোচড় দিল রানা, আরেকহাতে ওয়ালথার তৈরি। তালা মারা নেই, ঘুরল নব, ঠেলা দিতেই খুলতে শুরু করল। ক্যাঁচ করে উঠল কজা। দ্রুত অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকেই একপাশে সরে দাঁড়াল ও।

'বাঁচান!' রাবিতার চাপা গলা শুনতে পেল রানা বিছানার দিক থেকে।

আবছা একটা দীর্ঘ আকৃতি দেখল রানা, শীতের পোশাক পরনে থাকায় আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। রাবিতার বিছানা থেকে ছিটকে উঠল লোকটা, এক লাফে রানার সামনে পড়েই প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বসল। সরে যাওয়ার সময় পেল না রানা, থুতনিতে ঘুসি খেয়ে পিছিয়ে গেল। হাত থেকে ওয়ালথার ছুটে গেছে। পড়ে যাওয়ার আগে খামচে ধরল ও লোকটার কলার, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে লোকটাকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। মাথা ঠুকে গেল রানার। ওর তলপেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল লোকটা, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘুসি খেয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে রানার, অন্ধকারে হাতড়ে ওয়ালথারটা তুলে নিল। ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রাবিতা। করিডরে উঁকি দিল রানা। কেউ নেই। করিডরের শেষ মাথার দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য বাতাসের আওয়াজ তীব্র শোনাচ্ছিল, আবার অস্পষ্ট হয়ে গেল আওয়াজটা।

'খুব লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তাকিয়ে আছে দূরের দরজাটার দিকে।

ফুঁপিয়ে উঠল রাবিতা। 'হঠাৎ করে এলো লোকটা...আমি ঘুমাচ্ছিলাম...মুখ চেপে ধরল...আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল... জানতে চাইছিল আপনি এখানে কী করছেন।'

বাতি জ্বালল রানা, চট করে বিছানার ধারে বসে গায়ে কম্বল

জড়াল রাবিতা।

'আমার নাম ধরে জানতে চাইছিল?' পিস্তলটা কোমরে গুঁজল ও।

'হ্যাঁ।' লাল হয়ে উঠেছে রাবিতার মুখ। 'ধারণা করেছিল আমিও যৌথ বাহিনীর গোয়েন্দা। জিজ্ঞেস করল কতোদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করছি, কী জানি, এ-সব।'

'আপনি কী বললেন?'

'কিছুই না। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। তারপর আমাকে চড় মেরে বসল লোকটা।'

'কিছুই বলেননি?'

মাথা নাড়ল রাবিতা। 'তারপরই তো আপনি এলেন। ...আপনার কিছু হয়নি তো?'

মৃদু হাসল রানা। 'তেমন কিছু না। মাথা ফুলেছে সামান্য।...লোকটা দেখতে কেমন?'

'আঁধারে দেখিনি।'

'কথার সুরে কী মনে হলো; আমেরিকান, রাশিয়ান, জার্মান, ব্রিটিশ না কি চায়নিজ?'

সামান্য ভেবে মাথা নাড়ল রাবিতা। 'জানি না, রানা। ফিসফিস করে কথা বলছিল লোকটা। এতো ভয় পেয়েছিলাম যে...' চুপ হয়ে গেল।

মেঝে থেকে বড় একটা কালো বোতাম তুলল রানা। 'আপনার?'

'না।'

কোন ইনসিগনিয়া নেই বোতামে, মালয়েশিয়ান ইউনিফর্মের মতো। পালিয়ে যাওয়া লোকটার পার্কা থেকে খসে পড়েছে। সূত্র হিসাবে এটা তেমন কিছু না, তবে কিছুই না থাকবার চেয়ে ভাল।

সম্ভবত কমিশনের কেউ জানে ও তদন্ত করতে ইন্সটলেশনে যাচ্ছে, জানতে চায় আসলে ওর উদ্দেশ্য কী, কতোটা জানে ও,

আসলে ও কে। তার মানে কেউ একজন রানার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত। কারণ? সম্ভবত কিছু একটা লুকাবার আছে তার। কিন্তু লোকটা যে-কেউ হতে পারে—এমনকী মালয়েশিয়ান হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বোতামটা পকেটে রাখল রানা। রাবিতার চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'আমি চাই না আজকের ঘটনা আর কেউ জানুক।'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করে উঠল রাবিতা। 'কিন্তু আমরা মারা যেতে পারতাম!'

'মারা যাইনি।' গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'যে এসেছিল সে তথ্যের জন্যে এসেছিল। কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই।'

'কর্নেল মাহমুদকে অবশ্যই জানাতে হবে।'

'না।' কড়া শোনাল রানার গলা।

'কী হচ্ছে এখানে, রানা?' নার্ভাস ভঙ্গিতে চুলে আঙুল চালাল রাবিতা।

মেয়েটার পাশে বসল রানা। 'আমি এখনও জানি না, রাবিতা। তবে জানব। সেজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। কাজটা সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে হলে নিজের মতো করে তদন্ত করতে হবে আমাকে। আজকের ঘটনা কাউকে বলা চলবে না, রাবিতা, ঠিক আছে?'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভরতা খুঁজল মেয়েটা। বার কয়েক কাঁপল লোভনীয় পুরুষ্টু ঠোঁট দুটো, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী?'

গালে রক্তিম ছোপ লাগল রাবিতার। 'আজ রাতে আমার সঙ্গে এ-ঘরেই থাকবেন আপনি। একা থাকতে পারব না। ভয় করছে।'

মুচকি হাসল রানা। 'আমারও কিন্তু ঘুম দরকার। এ-ঘরে

বিছানা মাত্র একটাই।'

'আমার পাশে জায়গা আছে।' কম্বল গায়ে আরও টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল রাবিতা। ফিসফিস করে বলল, 'প্লিইজ!'

দরজায় তালা দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল রানা, রাবিতার পাশে শুয়ে পড়ল সরু খাটে। ওর উপর কম্বল টেনে দিল রাবিতা। গায়ে গায়ে স্পর্শ লেগে যাচ্ছে। রানা টের পেল এখনও অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটার শরীর। আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠল কম্বলের ভিতরটা। পেলব একটা হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল। গালে রাবিতার গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া। বাইরে বয়ে চলেছে অ্যান্টার্কটিকার হিমশীতল হাওয়া। ঘরের ভিতরেও ঝড় উঠল কিছুক্ষণ পর। একসময় ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল ওরা।

ভোরে উঠে করিডরের শেষ মাথার বাথরুম থেকে গোসল সেরে নিল ওরা, বাইরে যাওয়ার উপযুক্ত পোশাক পরে চলে এলো ব্যস্ত ডাইনিং হলে। মস্ত ঘর। লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রেতে খাবার নিল ওরা, কর্নেল মাহমুদ হাতের ইশারায় ওদের নিজের টেবিলে বসতে আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ একটা টেবিলের মাথায় বসে আছেন তিনি। দু'পাশে ক'জন অপরিচিত লোক। তাদের সঙ্গে একজন সুন্দরী যুবতীও আছে। জার্মান, আন্দাজ করল রানা।

'এঁরা কর্নেল মাসুদ রানা আর ডক্টর রাবিতা আশরাফ,' পরিচয় করিয়ে দিলেন তিব্বত মাহমুদ। 'আমাদের তদন্ত টীমের সদস্য।'

মাথা দুলিয়ে নতুনদের স্বাগত জানানো হলো।

'পরে আরও ভাল করে বিস্তারিত পরিচয় দেয়া যাবে,' বললেন কর্নেল, 'আগে ব্রিফিঙ, ঠিক আছে?'

পাশাপাশি বসল রানা আর রাবিতা।

নীরবে চলল নাস্তার পালা। পরিবেশে একটা টানটান চাপা উত্তেজনা। পুরো ঘরেই যেন শ্বাস আটকে রাখবার মতো একটা

পরিস্থিতি। সবাই জানে, রিসার্চ ইন্সটলেশনে মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই তদন্তের ফলাফল জানবার জন্য।

আধঘণ্টা পরে কফির কাপ সামনে থেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা আসুন। ব্রিফিং রুমে আলোচনা শুরু করব আমরা। আশা করছি দুপুরের দিকে রওনা হতে পারব সবাই।'

বিড়বিড় করে সম্মতি জানালেন বিজ্ঞানীরা। অন্যদের সঙ্গে কর্নেলকে অনুসরণ করল রানা আর রাবিতা। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের ভিতর দিয়ে চলে এলো ওরা আরেকটা শীতল টানেলে, সেটা ধরে পৌঁছুল বিরাট একটা ঘরে। একটা মাত্র টেবিল রয়েছে ঘরটাতে, টেবিলটাকে ঘিরে রেখেছে দশটা চেয়ার।

মাথার দিকের চেয়ারে বসলেন কর্নেল তিব্বত। রানা আর রাবিতা তাঁর ডানে। সবাই বসবার পরে গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন কর্নেল, 'ইচ্ছে করলে সিগারেট খেতে পারেন আপনারা। নোট প্যাড আর পেন্সিল রাখা আছে, নোট নিতে পারবেন। আপনাদের ইকুইপমেন্ট আর সাপ্লাই এখন হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছে। ব্রিফিং শেষে যতো দ্রুত সম্ভব রওনা হবো আমরা।'

'কী ঘটেছে ইন্সটলেশনে, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল টেবিলের আরেক মাথায় বসা জার্মান রূপসী।

'আসছি আমরা সে-কথায়, ডক্টর র‍্যাচেল বনেট,' বললেন কর্নেল। 'তবে প্রথমে পরিচয়ের পালা চুকিয়ে নিই, তারপর জানাচ্ছি ইন্সটলেশনের বর্তমান অবস্থা। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব তদন্ত কীভাবে চলবে।'

'আর ততোক্ষণে আপনার লোকেরা সমস্ত প্রমাণ সরিয়ে ফেলবে?' লালচে চেহারার এক লোক টেবিলের শেষ মাথা থেকে বাঁকা সুরে প্রশ্নটা করল।

'আমরা বা আর কেউ সাইটে যায়নি,' শুকনো স্বরে বললেন কর্নেল। 'আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি এ-ব্যাপারে।'

আর কেউ কোন কথা বলল না। কর্নেল একজন একজন করে রানা আর রাবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার। রানা আর রাবিতার পরিচয় হিসাবে জানালেন, জেনেটিক সায়েন্টিস্ট ওরা।

কর্নেল আরও কিছু বলবার আগেই উঠে দাঁড়াল রানা। কেউ একজন ভাল করেই জানে ও বিজ্ঞানী নয়। সে-লোক এই কমিটির কেউ হতে পারে। আগেই ব্যাপারটা খোলাসা করা দরকার।

'কর্নেল তিব্বত মাহমুদ আমার যে পরিচয় দিলেন এ-ঘরের বাইরের সবাই তা-ই জানে,' ধীর গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আপনাদের কাছে বলতে দ্বিধা নেই, আমি আসলে বিজ্ঞানী নই, আমি মালয়েশিয়ান সামরিক বাহিনীর তদন্তকারী অফিসার।'

নিচু গলায় প্রতিবাদের সুরে কথা বলে উঠল কয়েকজন। হাত তুলে তাদের চুপ করাল রানা।

'আমাদের রিসার্চ ইন্সটলেশনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমাকে পাঠানো হয়েছে আসলে কী ঘটেছে সেটা জানার জন্যে। এটাই স্বাভাবিক। আপনারা এই তদন্তে অংশ নিচ্ছেন, কারণ অ্যান্টার্কটিকা আন্তর্জাতিক এলাকা। এখানে যা ঘটেছে তাতে আমাদের সবার দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু এ-কথা ভুলে যাবেন না, সব দায়-দায়িত্ব আমাদের, অর্থাৎ মালয়েশিয়ার। কাজেই তদন্ত মালয়েশিয়া করবে এতে আপনাদের আপত্তির কিছু দেখছি না আমি।'

বসল রানা। কয়েকজনের চেহারা দেখে মনে হলো ও নিজের সত্যিকার পরিচয় দেওয়ায় তারা খুশিই হয়েছে। আবার কয়েকজন মুখ কালো করে নিজেদের গোপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

রানার দিকে তাকিয়ে আছেন কর্নেল তিব্বত, ওর আর কোন বক্তব্য নেই বুঝে পরিচয়ের পালা চুকাতে ব্যস্ত হলেন।

কমিটিতে আছেন ডক্টর ডেভিড কালাহান, আমেরিকান

জেনেটিক সায়েন্টিস্ট: ডক্টর ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ, ফ্রেঞ্চ কেমিস্ট: ডক্টর হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন, ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজিস্ট: ডক্টর র্যাচেল বনেট, জার্মান ডাক্তার; ডক্টর সুং চ্যান, চাইনিজ ডাক্তার; ডক্টর স্তভিচ মিলোশোভিচ, রাশান জেনেটিস্ট; ভারত থেকে এসেছেন জেনেটিস্ট ডক্টর হিতৈষী চক্রবর্তী।

রানা, রাবিতা, কর্নেল এবং এঁরা—মোট দশজন। নটা দেশ থেকে চার ধরনের বিজ্ঞানী এসে হাজির হয়েছেন এই দুস্তর অ্যান্টার্কটিকায়। বেশিরভাগের উদ্দেশ্য? চোর ধরা। রানা খেয়াল করেছে, ইতিমধ্যেই পরস্পরের সঙ্গে ছোটখাটো ঠোকাঠুকি বেধে গেছে কয়েকজনের। পরে সমস্যা আর দূরত্ব আরও বাড়বে বই কমবে না। রানা পরিষ্কার বুঝতে পারছে তাদের সামনে যে-কাজটা আসছে সেটা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা সহজ হবে না। ওদিকে উদ্ধার করতে হবে হারিয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীদের। কোথায় তাঁরা?

'আমি আমার প্রতিবাদটা জানিয়ে রাখতে চাই,' গমগমে গলায় বললেন আমেরিকান জেনেটিক সায়েন্টিস্ট ডেভিড কালাহান। 'এটা একটা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক তদন্ত। এখানে এই কমিটিতে মালয়েশিয়ানদের কোন গোয়েন্দা অফিসারকে অন্তর্ভুক্ত করা মোটেই ঠিক হয়নি।'

'আপনার আপত্তি আমি নোট করে নিলাম, ডক্টর,' বললেন কর্নেল তিব্বত মাহমুদ।

'তো? এখন কী করবেন?'

'কী করব মানে, ডক্টর?'

'আমার আপত্তি সাপেক্ষে কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন?'

'কিছুই না, ডক্টর,' বিরক্তি লুকিয়ে রাখলেন কর্নেল। 'এবার অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা বলবার আছে।'

আপত্তি করল না কেউ। ব্রিফিং শুরু করলেন কর্নেল। মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছ থেকে যা জেনেছে কর্নেলের কথা

থেকে তার বেশি কিছুই জানা হলো না রানার। মালয়েশিয়া বায়োলজিকাল উইপন তৈরি করছিল সেটা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন তিব্বত মাহমুদ।

'আপনি বলছেন নিরাপদ গবেষণা,' আবারও গমগম করে উঠল ডক্টর কালাহানের গলা, কুঁচকানো ভ্রূ আরও কুঁচকে গেছে। নাকটা করমচার মতো লাল। 'তা হলে আপনাদের লোকজন মারা গেল কীভাবে?'

'মারা গেছে কি না, কিংবা কীভাবে–সেটা জানাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য, ডক্টর,' এখনও বিরক্তির চিহ্ন নেই কর্নেলের চেহারায়।

'বলে যান, শুনি,' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল আমেরিকান সায়েন্টিস্টের বলবার ভঙ্গিতে।

'বলছি, ডক্টর।' রানাকে দিয়ে নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন কর্নেল। 'পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা যতোটুকু জানি সে-ব্যাপারে কারও কোন প্রশ্ন?'

'আবার কোন টীমকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেখে আসার জন্যে?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন, ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজিস্ট।

'আবহাওয়া ভাল থাকলে প্রতি চারঘণ্টা পরপর ইন্সটলেশনের ওপর দিয়ে চক্কর মেরে আসছে আমাদের পাইলট।'

'জীবনের কোন চিহ্ন?' ভ্রূ নাচালেন ডক্টর জনসন।

সিগারেটে বড় করে টান দিলেন কর্নেল। 'না।'

'এয়ার স্যাম্পল নেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ, ফ্রেঞ্চ কেমিস্ট।

'এখনও ঝুঁকিটা আমরা নিইনি, ডক্টর।'

কয়েকজন প্রতিবাদ করে উঠলেন। উঠে দাঁড়াল রাবিতা।

'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কর্নেল,' জোর দিয়ে বলল ও। 'আমরা জেনেছি হেলিকপ্টার পাইলট এবং ক্রু মাটিতে নামার পরপরই মারা গেছে। তাদের

মৃত্যুর কারণ যদি কোন বায়োলজিকাল এজেন্ট হয় তা হলে কেউ তাদের মতো অপ্রস্তুত অবস্থায় নামলে মারা যেতে পারে।'

'ফালতু কথা যতোসব,' আপত্তি করল জার্মান ডাক্তার র‍্যাচেল বনেট।

'মোটেও না,' নিজের মত থেকে সরল না রাবিতা। 'অত্যন্ত সাবধানে ইন্সটলেশনের কাছে যেতে হবে আমাদের। সবরকম সতর্কতা না নিলেই নয়। বায়োলজিকাল সেফ সুট পরব আমরা। প্রথম হেলিকপ্টারে যাব আমি, এয়ার স্যাম্পল পরীক্ষা করব। যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা না দেখি তা হলে জানাব। তখন অন্যরা আসবেন।'

'অ্যামিও যাব আপনার সঙ্গে,' জানাল র‍্যাচেল। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রাবিতা। দু'জনই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

'আর কারও কোন প্রশ্ন বা পরামর্শ?' সবার উপরে চোখ বুলালেন কর্নেল তিব্বত।

'একটা নিয়ম ধরে কাজ করতে হবে আমাদের,' কড়া শোনাল ডক্টর কালাহানের গলা। 'সেটা এখনই ঠিক করে নেয়া দরকার।'

'হ্যাঁ।' অ্যাশট্রেতে ফেলে টিপে সিগারেট নেভালেন তিব্বত মাহমুদ। 'প্রথমে অপেক্ষা করব আমরা অল ক্লিয়ার পাবার জন্যে, সেটা পেলে তারপর ইন্সটলেশনে ঢুকব। প্রথম কাজ হবে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমগুলো চালু করা। তাপ, পানি, খাবার, রেডিও কন্ট্যাক্ট। কাজের একটা লিস্ট তৈরি করেছি আমি।'

কেউ কোন আপত্তি করল না।

'ভেতরে ঢোকার পরে...লাশ, যদি থাকে, সরাতে হবে।' কথাটা ঘরের আবহাওয়া থমথমে করে তুলল। 'ওখানে যে-কারণেই আমাদের লোকদের মৃত্যু হয়ে থাকুক না কেন, জিনিসটা দ্রুত কাজ করে। এতোই দ্রুত, কেউ রেডিওতে কিছু জানানোরও সুযোগ পায়নি। কাজেই আমরা বিভিন্ন ডিউটি স্টেশনে লাশ পাব। ফটো তুলতে হবে ওগুলোর, কোথায় কীভাবে মারা পড়েছে সেটা

টুকে রেখে মাঝখানের ঘরে লাশগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

কর্নেল থামবার পরেও কেউ কোন কথা বলল না।

'একটা প্যাথোলজি ল্যাবোরেটরি তৈরি করতে হবে তারপর। আমি চাই আমাদের ডক্টর র‍্যাচেল আর সুং চ্যান ওটার দায়িত্ব নিন। সঙ্গে থাকবে আমাদের জেনেটিস্ট এবং মাইক্রো-বায়োলজিস্ট, ডক্টর হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন।'

'প্যাথোলজিস্ট সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমি কাজ করব,' জানালেন ডক্টর হিতৈষী চক্রবর্তী।

মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন কর্নেল।

'আর আমরা?' জিজ্ঞেস করল রাবিতা।

'সেটা নির্ভর করবে কী প্যাথোলজিকাল রিপোর্ট পাওয়া যায় তার ওপর। আমাদের মূল কাজ কী জিনিস সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে সেটা খুঁজে বের করা।'

'সায়েন্টিস্টদের কাজ বুঝলাম,' টিটকারির সুরে বললেন কালাহান। 'আপনি আর কর্নেল রানা কী করবেন?'

'যা দরকার পড়বে,' জবাবটা রানা দিল। 'শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বে থাকব আমরা।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন ডক্টর কালাহান। 'সবচেয়ে কঠিন কাজ, তাই না?'

কয়েক ঘণ্টা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার পরে শেষ হলো মীটিং। প্রায় পুরোটা সময় কেটেছে কোন্ ধরনের বায়োলজিকাল এজেন্ট মানুষগুলোকে খুন করতে পারে সেটা নিয়ে। হেলিকপ্টার পাইলট আর ক্রুদের শেষ করে এই বিরূপ আবহাওয়ায় এখনও জিনিসটা সক্রিয় আছে কি না এ-নিয়েও প্রচুর তর্ক হয়েছে।

মীটিং শেষে নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে তৈরি হয়ে আসতে সবাইকে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো। এক ঘণ্টা পর রিসার্চ ইন্সটলেশনের দিকে রওনা

হবে হেলিকপ্টার।

অন্যান্যরা চলে যাওয়ার পরেও রয়ে গেল রাবিতা আর রানা। কর্নেল তিব্বত চেয়ার ছাড়েননি, সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'কী বুঝলেন, কর্নেল রানা?'

'ডক্টর কালাহান ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা। 'সবার মধ্যে শান্তি বজায় রেখে কাজ করে যাওয়া কঠিনই হবে।'

'এ-ব্যাপারে আমাদের তেমন কিছু করার আছে বলে মনে হয় না,' সায় দিলেন কর্নেল। 'ওপরের নির্দেশ। কমিটি যেমন আছে তেমনই থাকবে।'

'কালাহান বিজ্ঞানী নয়,' বলে বসল রাবিতা।

রানা আর কর্নেল তিব্বত মাহমুদ, দু'জনই ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

'কালাহান, সে যদি আমেরিকান জেনেটিক সায়েন্টিস্ট হয় তা হলে আমি আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার।'

'কোথাও কোন ভুল হচ্ছে না তো, রাবিতা?'

'না। কী বলছে সে-সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। আমার মনে হয় ডক্টর চক্রবর্তীও টের পেয়েছেন। ব্রিটিশ ডক্টর ব্যাপারটা ধামাচাপা দেন।'

'আমেরিকা-ব্রিটেন,' নিচু গলায় বললেন কর্নেল। 'সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

'রবার্ট কালাহান একজন নামকরা জেনেটিক সায়েন্টিস্ট,' বলল রাবিতা। 'কিন্তু অনেক বয়স্ক লোক তিনি। আমি প্রথমে একে তাঁর ছেলে মনে করেছিলাম। কিন্তু এই কালাহান তাঁর ছেলে নয়।'

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে,' গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল তিব্বত মাহমুদের চেহারা। 'লোকটাকে এই কমিশনে রাখা যায় না। সম্ভবত সিআইএর এজেন্ট।'

'কালাহান থাকুক,' বলল রানা।

'অসম্ভব...আমি...'

রানা থামিয়ে দিল কর্নেলকে। 'আগে দয়া করে আমার কথাটা শুনুন। কালাহান যদি সিআইএ হয়, আর না জানে যে আমরা তাকে সন্দেহ করছি, তা হলে হয়তো বড় ধরনের সুবিধে হবে।'

'কীভাবে?'

'এটা যদি দুর্ঘটনা না হয়ে থাকে, স্যাবোটাজ হয়, আর কাজটা যদি আমেরিকা করে থাকে, তা হলে কালাহান তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। আমরা ওর ওপর চোখ রাখব।' রাবিতার চেহারায় আপত্তির ছাপ দেখল রানা। 'এমনও হতে পারে কালাহানকে নজরে রেখেই জানা যাবে ওখানে আসলে কী ঘটেছে।'

'অনেক বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়,' বলল রাবিতা।

'রাবিতা ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন কর্নেল। 'অনেক নিরীহ মানুষের জীবন যেতে পারে আমাদের ভুলে।'

'এমনিতেই অনেক নিরীহ মানুষের অমূল্য জীবন চলে গেছে, কর্নেল,' বলল রানা। 'কারণ খুঁজে বের করাটা আমাদের দায়িত্ব।'

দ্বিধায় ভুগছেন কর্নেল মাহমুদ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'আপনার দায়িত্বে থাকবে কালাহান?'

'হ্যাঁ।'

বড় করে দম নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন কর্নেল। 'ঠিক আছে। আপনারা মালপত্র নিয়ে আসুন। আমি যাচ্ছি আবহাওয়ার খবর নিতে। আর পঞ্চান্ন মিনিট পরে রওনা হবো আমরা।'

মীটিং রুম থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারে চলে এলো রানা আর রাবিতা। নিজের ঘরে ঢুকবার আগে রানার বাহুতে হাত রাখল মেয়েটা। 'কাল রাতের ঘটনা বললে না কেন?'

'কর্নেল তিব্বত একজন জাত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, শান্তিকালীন সময়ের অফিসার। কী ঘটেছিল জানলে তদন্ত করতে যাওয়ার আগে সমস্ত কিছু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতেন উনি। দেরি হয়ে যেত তদন্তে।'

'সেটাই হয়তো ভাল হতো, রানা।'

'ইন্সটলেশনে কী ঘটেছে সেটা হয়তো জানা যেত না আর।'

রানার চোখের দিকে তাকাল রাবিতা। 'আমার ভয় করছে, রানা।'

রানা ওর কপাল থেকে একগোছা চুল সরিয়ে দিল, চোখে গভীর সান্ত্বনা। রানার বাহুতে চাপ দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল রাবিতা।

চার

দুপুর মাত্র পার হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার নামতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। দিগন্তের কোলে মুখ লুকাচ্ছে সূর্য। আর কয়েক সপ্তাহ পরে চব্বিশ ঘণ্টাই চলবে অন্ধকারের রাজত্ব। অক্টোবরে আবার আলো আর জীবন নিয়ে আসবে নতুন বসন্ত।

বাতাসের তাড়া খেয়ে ঘরগুলোর ছাদ থেকে ভাসতে ভাসতে উড়ে চলেছে তুষারের মিহি কণা, পাতলা মখমলের পর্দার মতো দেখাচ্ছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং থেকে বের হলো দশজনের দলটা, প্রত্যেকের পরনে শীতের পোশাকের উপর বায়োলজিকাল সেফ সুট। হাঁটতে শুরু করল তারা হেলিকপ্টারের দিকে। ইন্সটলেশনের কাছে যাওয়ার পর ব্যবহার করবে সবাই এয়ার ট্যাঙ্ক আর হেলমেট।

দুটো হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ধীরে ধীরে ঘুরছে ওগুলোর রোটর ব্লেড।

পিছনের হেলিকপ্টারটায় উঠল রানা, কর্নেল মাহমুদ এবং অন্যান্যরা। কো-পাইলটের পিছনে বসল রানা, বেঁধে নিল সিটবেল্ট। অন্যটায় চড়েছে রাবিতা আর ডক্টর র‍্যাচেল। আগে উঠল ওটা একরাশ তুষার উড়িয়ে। একটার পিছনে রওনা হয়ে গেল আরেকটা। রাবিতা অল ক্লিয়ার সিগনাল দেওয়ার পর নির্দিষ্ট সীমা পেরোবে পিছনের কপ্টার।

অনেকটা উপরে উঠবার পর রস্ আইস-শেলফ আর ম্যাকমার্ডো সাউন্ড পরিষ্কার দেখা গেল। ওটা পেরিয়ে খানিক পরে নীচে দেখা গেল মালয়েশিয়ান হেডকোয়ার্টারের এলোমেলো বাড়ি-ঘর। আরও ভিতরের দিকে ধবধবে সাদা বরফ আর তুষারের বিস্তার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

সামনের কপ্টার আরও উপরে উঠল, তারপর ডানদিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল একশো মাইল দূরের রিসার্চ ইন্সটলেশনের উদ্দেশে। রানাদের কপ্টার এখন স্থির। কপ্টারের ভিতরে চোখ বুলাল রানা, সবাই মুখ নিচু করে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন। একেকজনের মনোভাব একেকরকম, তবে রানা একজনের মনোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত। মুখে বলছে না, কিন্তু দুর্ঘটনার ব্যাপারে কালাহান আর সবার চেয়ে অনেক বেশি জানে।

কমিউনিকেশন রেডিও খড়মড় করে উঠল।

'ইউনিট ওয়ান,' বলল রানাদের পাইলট। 'আমরা দশ মাইল পেছনে আছি। রওনা হচ্ছি এখন।'

'রজার, ইউনিট টু। ইটিএ বেয়াল্লিশ মিনিট পরে।'

সামনে ঝুঁকলেন কর্নেল মাহমুদ, পাইলটের কাঁধে টোকা দিলেন। মাইক্রোফোন নিয়ে বললেন, 'ইউনিট ওয়ান, আমি কর্নেল মাহমুদ। ইন্সটলেশন দশ মাইল দূরে থাকতে হেলমেট পরে নেবেন সবাই, এয়ার ট্যাঙ্ক ব্যবহার করবেন। এটা একটা নির্দেশ।'

'রজার, কর্নেল।'

'আবার বলছি, কোন ঝুঁকি যাতে নেয়া না হয়। ডক্টর রাবিতা আর ডক্টর র‍্যাচেলকে নামিয়ে দিয়েই সরে আসবেন, দেরি না করে ফিরে যাবেন বেস ক্যাম্পে।'

রেডিও নীরব হয়ে রইল।

'নির্দেশ বুঝেছেন, ইউনিট ওয়ান?'

'এক সেকেন্ড, কর্নেল। মনে হলো কী যেন দেখলাম।'

'কী?'

'নীচে কী যেন নড়ছে মনে হলো। আপনি বললে কপ্টার ঘুরিয়ে দেখতে পারি ঠিক দেখেছি কি না।'

'নেগেটিভ!' প্রায় ধমকে উঠলেন কর্নেল। 'ইন্সটলেশনের দিকে যান।'

'রজার।'

'একটু পরপর খবর দেবেন।'

'নিশ্চয়ই, কর্নেল!'

মাইক্রোফোন ফিরিয়ে দিয়ে সুইভেল চেয়ার ঘোরালেন কর্নেল, জানালা দিয়ে নীচের বিরান ভূমির দিকে তাকালেন।

'কী দেখতে পারে পাইলট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না,' জানালা থেকে সরলেন না কর্নেল। 'সম্ভবত কিছুই দেখেনি। এতো অল্প আলোয় এই বাতাস আর তুষারে ভুল দেখা স্বাভাবিক।'

'আমাদের কেউ নেই তো ওখানে?'

'না, কর্নেল রানা।' রানার দিকে তাকালেন কর্নেল মাহমুদ। সবক'জন বিজ্ঞানী ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'নীচে কিছুই নড়ার কথা নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা বড় ঝড় আসছে। অন্য কেউ এখন ওখানে থাকবে তা-ও অসম্ভব।'

রোটরের একটানা আওয়াজ বাদ দিলে কপ্টারের ভিতর নীরবতা নামল। আবার জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল। রানাও নীচে দেখল। দ্রুত কমে আসছে আলো। আর

কয়েক মিনিট পরেই নামবে রাতের আঁধার।

বায়োসুটের চেইন খুলে পার্কার ফাঁক দিয়ে একটা সিগারেট বের করল রানা, ওটা ধরিয়ে তলিয়ে গেল নিজের ভাবনায়।

ধরা যাক, রিসার্চ ইন্সটলেশনে সত্যিই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকা নিজেও বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ার এজেন্ট নিয়ে রিসার্চ করছে। মুখে যতো যা-ই বলুক আর অন্যান্য দেশকে যতোই ধমকি দিক—ওরা যে মালয়েশিয়ার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক।

এখানে ওর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র সন্দেহের চোখে দেখবে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স। ধরেই নেবে মালয়েশিয়ার হয়ে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পাঠানো হয়েছে ওকে। এবং ইতিমধ্যে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স জেনে গেছে কাছাকাছি কোথাও ভাইরাসঘটিত দুর্ঘটনা ঘটেছে। জিনিসটার খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে দিয়েছে নিশ্চয়ই তারাও। কালাহান তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

আধঘণ্টা পর আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও।

'ইউনিট টু, ইউনিট ওয়ান বলছি। রিসার্চ ইন্সটলেশন দশ মাইল বাকি আছে আর। আমরা থামছি।'

'ঠিক আছে, ইউনিট ওয়ান,' জবাব দিল রানাদের কপ্টার পাইলট। পাঁচশো ফুট উপরে কপ্টার দাঁড় করিয়ে ফেলল সে। নীচে দেখা যাচ্ছে বরফ আর তুষারের এবড়োখেবড়ো চেহারা। সামনের কপ্টারের যাত্রীরা এখন হেলমেট আর সেফসুট পরতে ব্যস্ত।

পাঁচ মিনিট পরে আবার শব্দ করল রেডিও।

'আমরা তৈরি, কর্নেল।'

কর্নেল মাহমুদের দিকে তাকাল পাইলট। আস্তে করে মাথা দোলালেন কর্নেল।

'ইউনিট ওয়ান, এগোন। আমরা আপনাদের পেছনে আসছি।'

রাতের আঁধার ভেদ করে আবার ছুটতে শুরু করল কপ্টার। ইন্সটলেশনের কাছে যাওয়ার পরে কী ঘটবে ভাবছে সবাই। পরিবেশে একটা থমথমে উত্তেজনা।

ইউনিট ওয়ানের পাইলটের গলা আবার শোনা গেল।

'আমরা এখন ইন্সটলেশন দেখতে পাচ্ছি।'

পাইলটের কাছ থেকে মাইক্রোফোন নিলেন কর্নেল মাহমুদ। 'ঠিক আছে। সাবধান! নীচের অবস্থা যদি খারাপ মনে হয়, মনে হয় না নামাই উচিত, তা হলে সরে আসুন। কি বলেছি বুঝতে পারছেন?'

'রজার।'

'ঠিক আছে। কী ঘটছে বলতে থাকুন।'

'দুশো ফুট ওপরে আছি এখন আমরা। কয়েক মিনিট এই উচ্চতায় থাকব। ডক্টর রাবিতা এয়ার স্যাম্পল নিতে চাইছেন।'

গতি কমল রানাদের কপ্টারের, তারপর শূন্যে থেমে দাঁড়াল। ইন্সটলেশন থেকে ঠিক দশ মাইল দূরে আছে।

'ক্যাম্প থেকে কতো দূরে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'দুশো গজ। ডক্টর রাবিতা এয়ার স্যাম্পল নিয়েছেন। এক মিনিট, সার।'

কপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ আর রেডিও-র হিসহিস ছাড়া রানাদের কপ্টারে আর কোন আওয়াজ নেই। এবার ভেসে এলো রাবিতার গলা।

'এখানে বাতাস পরিষ্কার।'

সামনে ঝুঁকলেন ডক্টর হিতৈষী। 'ডক্টর রাবিতাকে জিজ্ঞেস করুন পারটিকুলেট্স্ ফিল্টার কতোখানি গভীর ভাবে করেছেন উনি।'

'ওয়ান পার্ট পার বিলিয়ন,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রাবিতা। 'হিটারে রেখে কার্বোন ডাই-অক্সাইড টেস্টও করেছি। বাতাস দূষণমুক্ত।'

ডক্টর হিতৈষীর দিকে তাকালেন কর্নেল। এক মুহূর্ত ভেবে আস্তে করে মাথা দোলালেন ডক্টর।

'ঠিক আছে,' বললেন কর্নেল, 'ইউনিট ওয়ান, ইচ্ছে করলে আরেকটু সামনে যেতে পারেন।'

'রজার। ঠিক মেইন বিল্ডিঙের সামনে নামব আমি।'

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়, তারপর আবার শোনা গেল রাবিতার কণ্ঠ।

'মাটিতে নেমেছি আমরা, মেইন বিল্ডিং থেকে বিশ গজ দূরে। বাতাস এখনও দূষণমুক্ত।'

'আপনারা কী বলেন?' উপস্থিত বিজ্ঞানীদের উপর চোখ বুলালেন কর্নেল।

আস্তে করে মাথা দুলালেন ডক্টর হিতৈষী। 'বিল্ডিঙের দিকে যেতে বলুন। ইসের কাছে···ওই পাইলটের দেহের কাছে।'

মাইক্রোফোন মুখে তুললেন কর্নেল। 'ঠিক আছে, ডক্টর রাবিতা, আপনি আর ডক্টর র‍্যাচেল ইকুইপমেন্ট নিয়ে নেমে পড়ুন। পাইলটকে ছেড়ে দিন। অবশ্য পরিস্থিতি নিরাপদ মনে করলে, নইলে সরে আসতে পারেন।'

'বিল্ডিঙের কাছে আরেকবার এয়ার স্যাম্পল নেব আমি,' জানাল রাবিতা।

'রজার। ইউনিট ওয়ান, ডক্টর রাবিতা অল ক্লিয়ার সিগনাল দিলেই ইকুইপমেন্ট নামিয়ে বেস ক্যাম্পে ফিরে যাবেন আপনি।'

'রজার, কর্নেল।'

আবার নীরবে কাটল কয়েক মিনিট।

'উনি ফিরে আসছেন,' যান্ত্রিক স্বরে বলে উঠল ইউনিট ওয়ানের পাইলট। 'না। আসছেন না···ডক্টর র‍্যাচেলকে ডাকছেন।'

'কী ব্যাপার?' গলা চড়ে গেল কর্নেলের। 'কী ঘটছে ওখানে?'

'জানি না, সার।···একটু অপেক্ষা করুন। এবার ওঁরা ফিরে

আসছেন।'

রানার দিকে তাকালেন কর্নেল মাহমুদ, চেহারায় জমেছে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। নড়েচড়ে বসলেন বিজ্ঞানীরা।

'এখানে কোন সমস্যা নেই,' রেডিওতে রাবিতার গলা ভেসে এলো। 'আনলোড করছি। আপনারা আসতে পারেন।'

'আমরা আসার আগে পর্যন্ত বিল্ডিঙের বাইরেই থাকুন ডক্টর রাবিতা।'

'অপেক্ষা করছি।'

পাইলটকে হাতের ইশারা করলেন কর্নেল, রাতের আঁধারে সামনে বাড়ল কপ্টার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা সামনের মেশিনের আলো দেখবার জন্য।

'আনলোড করে ফেলেছেন ওঁরা,' জানাল সামনের কপ্টারের পাইলট। 'আমি ফিরছি।'

অন্ধকারে ফিরতি কপ্টারের আলো চোখে পড়ল রানার।

'দেখেছি,' রেডিওতে বলল পাইলট, 'আমি নিচু দিয়ে যাচ্ছি, রালফ।'

'গুডলাক,' জবাব এলো। আরও উপরে উঠতে শুরু করল প্রথম কপ্টার, ফিরে যাচ্ছে বেস ক্যাম্পে।

নিচু দিয়ে গিয়ে মেইন বিল্ডিঙের বিশগজ সামনে নামল রানাদের কপ্টার, ওখান থেকে রাবিতা আর ডক্টর র‍্যাচেলকে দেখতে পেল রানা, বেশ কিছুটা দূরে তুষারে খানিক ডুবে যাওয়া কপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা একটা লাশের কাছে।

'হেলমেট পরে এয়ার সাপ্লাই চালু করে নিন সবাই,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল।

'বাতাসে কিছু নেই,' প্রতিবাদের সুরে বললেন কালাহান, কিন্তু রানা সহ অন্যরা হেলমেট পরে এয়ার সাপ্লাই নেওয়ায় তিনিও বাদ গেলেন না।

সবাই তৈরি হওয়ার পর দরজা খুলে দিল পাইলট,

ইকুইপমেন্ট নামাতে লাগল পাঁচ মিনিট, তারপরই বিদায় নিল কপ্টার, ফিরে যাচ্ছে বেস ক্যাম্পে।

'সবাই শুনতে পাচ্ছেন?' হেলমেটের ভিতরে বসানো ছোট্ট স্পীকারে কর্নেলের গলা শুনতে পেল রানা।

'পাচ্ছি,' জানালেন ডক্টর হিতৈষী। অন্যরাও সাড়া দিলেন।

সবাই গিয়ে দাঁড়াল রাবিতা আর ডক্টর র‍্যাচেলের কাছে। তারা এখনও লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ মেলে আছে লোকটা। মৃত্যু-ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। থুতনিতে জমাট বাঁধা কালচে-খয়েরী রক্ত।

মুখ তুলে আফসোস করে মাথা নাড়ল রাবিতা।

'কীভাবে মারা গেল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোন আন্দাজ?'

ডক্টর র‍্যাচেল তাকাল রানার দিকে। 'এখনও জানি না আমরা,' নিচু স্বরে বলল। 'কিন্তু কামড়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলেছে। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে অন্তত তিন জায়গায়। শরীরের অর্ধেক মাংসপেশি দুমড়েমুচড়ে বা ছিঁড়ে গেছে।'

'গুড লর্ড!' বিড়বিড় করল কে যেন।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাবিতা।

কপ্টারের দিকে চট করে তাকাল রানা। ক্রুর দেহটা দেখতে পেল। ওই লোকটা রেডিওতে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'রাবিতা, বিল্ডিঙের ভেতরে বাতাস পরীক্ষা করতে হবে।' কর্নেলের দিকে ফিরল। 'কর্নেল মাহমুদ, জেনারেটর চালু করার ব্যবস্থা করুন।...আর, ডক্টর র‍্যাচেল, আমার সঙ্গে আসুন।' জটলা করে দাঁড়ানো বিজ্ঞানীদের পাশ কাটিয়ে মৃত ক্রুর দিকে পা বাড়াল ও।

পাইলটের মতো একই অবস্থা হয়েছে ক্রুরও। তুষারে বসে আছে লাশটা, এক হাতে মাইক্রোফোন, অন্য হাতে .৪৫ মিলিটারি অটোমেটিক। এরও চোখ খোলা, চেহারায় কষ্টের ছাপ। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে মুখ থেকে, পার্কার সামনেটা ভিজে কালো হয়ে

গেছে। বুকের উপর পড়ে আছে জিভের কাটা টুকরো।

পরস্পরের দিকে তাকাল রানা আর ডক্টর র‍্যাচেল।

'পাইলট যেভাবে মারা গেছে এ-ও সেভাবে মরেছে কি না সেটা আমি জানতে চাই,' বলল রানা।

'জানার নিশ্চিত কোন উপায় আপাতত নেই, কর্নেল,' জানাল র‍্যাচেল। 'অটোপসি করতে হবে।'

'আন্দাজ?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লাশের উপর উবু হলো জার্মান মহিলা; মৃতদেহের পার্কার চেইন খুলে পিঠ হাতিয়ে দেখল। কাঁধ আর হাতও বাদ গেল না। কাজটা সেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল র‍্যাচেল। 'ক্ষয়-ক্ষতি একই রকম হয়েছে দু'জনের। জিভ ছিঁড়ে পড়েছে, মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেছে, ছিঁড়ে গেছে মাংসপেশী।'

'কী কারণে এমনটা হতে পারে?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাচেল। 'নার্ভ গ্যাস, একশো একটা কেমিকেল অথবা ড্রাগ আছে–যে-কোনওটা হতে পারে।'

'বায়োলজিকাল এজেন্ট?'

রানার কাছে সরে এলো র‍্যাচেল, মনে হলো ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলতে চায়, তারপর সবাই শুনছে জেনেও স্বাভাবিক গলায় বলল, 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এখন যে-পর্যায়ে আছে তাতে অসংখ্য এজেন্ট এই একই রেজাল্ট দিতে পারে, কর্নেল রানা। আপনি কি কোন্ এজেন্ট সেটা জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।' লাশের হাত থেকে ·৪৫ অটোমেটিকটা নিয়ে নিল রানা। সেফটি অন করে পকেটে রেখে দিল।

'হায় আল্লাহ্!' রাবিতার [redacted]ণ্ঠ শুনতে পেল ও হেলমেটের স্পীকারে।

'কী?' গলা চড়ে গেল রানার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দিকে ফিরে তাকাল। খোলা দরজার সামনে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

'আল্লাহ্!' আবার বলল রাবিতা।

দ্রুত পা বাড়াল রানা, পেছনে ডক্টর র‍্যাচেল। 'জলদি সরে এসো, রাবিতা!' তাগাদা দিল রানা। দরজার কাছে পৌঁছে সামনে দাঁড়ানো কালাহান আর হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

রাবিতার টর্চের সামান্য আলো ছাড়া বিরাট বড় ঘরটা অন্ধকার। ভিতরে শীতল পরিবেশ। টর্চ জ্বালল রানাও। হলদে আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত লাশগুলো দেখে মনে হলো জায়গাটা পৃথিবীর বাইরের কোনও প্রেতলোক।

এক মহিলা, অন্তত দেখে মনে হয় মহিলার দেহ; হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা টেবিলের উপরে।

কাউচে এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে তিনটে মৃতদেহ। বিস্ময়-ব্যথা-আতঙ্কের ছাপ তাদের চেহারায়। দু'টুকরো হয়ে যাওয়া জিভের কারণে থুতনি রক্তাক্ত। এ-ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার করিডরের মুখে পড়ে আছে অন্তত ছয়-সাতজন। একজনের গায়ে পোশাক নেই। ঘুম থেকে উঠেই মারা গেছে। ঘরের এক কোনায় বুক শেলফের সামনে পড়ে আছেন দু'জন বিজ্ঞানী। হাতের খোলা বই মেঝেতে।

রাবিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'এয়ার স্যাম্পল নিয়েছ?'

মুখ তুলে তাকাল রাবিতা, হেলমেটের ভিতরে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে দু'চোখ। 'আল্লাহ্! কী দেখছি এসব আমি? দুঃস্বপ্ন?'

'না,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল রানার। 'জানতে হবে কী ঘটেছে।' আবার জিজ্ঞেস করল, 'এয়ার স্যাম্পল নিয়েছ, রাবিতা?'

মাথা নাড়ল আতঙ্কিত মেয়েটা।

এগিয়ে এলেন ডক্টর হিতৈষী, রাবিতার হাত থেকে টেস্টিং ইউনিট নিয়ে নিজেই পরীক্ষা করলেন আউটার এয়ারলক খুলে।

দু'মিনিট লাগল কাজটা শেষ করতে। রানার দিকে তাকালেন। 'বাতাস ঠিকই আছে।'

'ভুল হচ্ছে না তো?' উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল আমেরিকান বিজ্ঞানী কালাহানের কণ্ঠে।

'যতোটা নিখুঁত ভাবে করা সম্ভব পরীক্ষা করেছি।' হেলমেট খুলতে শুরু করলেন ডক্টর হিতৈষী চক্রবর্তী। রানা নিজেরটা খুলতে হাত বাড়াতেই নিষেধ করলেন। 'আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন, কর্নেল। আমার যদি কিছু ঘটে তা হলে দু'মিনিটের মধ্যেই ঘটবে।'

এঁরাই সত্যিকারের জ্ঞানতাপস, মনে মনে কথাটা স্বীকার করে নিল রানা। ডক্টর হিতৈষীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব না করে পারল না।

কে যেন নিচু স্বরে গাল বকে উঠল। পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল অন্যরাও ঢুকেছে ঘরে।

'কর্নেল মাহমুদ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। হেলমেটের ভিতর দিয়ে চেহারাগুলো দেখল। কর্নেল নেই।

'জেনারেটর চেক করতে গেছেন,' জানালেন ফ্রেঞ্চ কেমিস্ট ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ।

আধসেকেন্ড পরে বাতি জ্বলে উঠল, দপদপ করে কাঁপল বারকয়েক, তারপর উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘর।

'নরক হয়ে গেছে!' বললেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন। অন্যরাও নিচু স্বরে নিজেদের ভাষায় বিড়বিড় করছেন।

'বাতাস ঠিক আছে,' জানালেন ডক্টর হিতৈষী।

হেলমেট খুলে ফেলল রানা, বুক ভরে দম নিল। বাতাস ভীষণ শীতল, কিন্তু কোন ধরনের কোন গন্ধ নেই তাতে।

পিছনে একটা ক্লিক শব্দ শুনতে পেল রানা, তারপরই গরম বাতাসের স্রোত বইতে শুরু করল। ইলেক্ট্রিসিটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিটারও চালু হয়েছে।

ডক্টর র‍্যাচেলও হেলমেট খুলেছে, বুঝতে পারল গরম বাতাস

বইতে শুরু করেছে। বলল, 'পচে যাওয়ার আগেই লাশগুলো বাইরে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বাতাস দূষিত হয়ে যাবে।'

ভিতরে ঢুকলেন কর্নেল তিব্বত মাহমুদ, পিছনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের অবস্থা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে তাঁর, নাকের পাটা ফুলে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'ডক্টর র‍্যাচেলের কথা অনুযায়ী এখন আমাদের লাশ সরাতে হবে,' বিরক্তির সুরে বলল কালাহান।

'এক মিনিট,' বাধা দিল রানা। 'আগে লাশগুলোর ছবি তুলতে হবে।'

'কাজটা করা কি জরুরী?' তর্ক জুড়তে চাইছে আমেরিকান এজেন্ট।

রানার পক্ষ নিলেন কর্নেল মাহমুদ। 'কী ঘটেছে তা জানতে হলে নিয়ম মতো সব কাজ সেরে ফেলা উচিত।'

'কী ঘটেছে তা তো দেখাই যাচ্ছে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কালাহান। 'মালয়েশিয়ান বোকামি।'

চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল মাহমুদ, মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল, এক ঝটকায় পকেট থেকে বেরিয়ে এলো একটা .৪৫ অটোমেটিক। ওটা আমেরিকানের থুতনির নীচে ঠেসে ধরলেন তিনি।

'কুত্তার বাচ্চা! আর একটা কথা বল্, তোর খুলি উড়িয়ে দেব আমি!'

'কর্নেল মাহমুদ,' শান্ত স্বরে বাধা দিল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা করুন।'

বরফের মতো জায়গায় জমে গেছে কালাহান, চোখ পিটপিট করে রাগে কম্পমান কর্নেলকে দেখছে, ঘনঘন ঢোক গেলায় উঠছে নামছে তার কণ্ঠার হাড়।

'না, কর্নেল!' আবারও বলল রানা। এবার অনুরোধের সুরে।

আস্তে করে পিস্তলটা সরিয়ে নিলেন কর্নেল মাহমুদ, পিছু

হটলেন দু'পা, চোখ থেকে ঝরছে নগ্ন ঘৃণা। নিচু স্বরে বললেন, 'তোমরা আধা-সভ্য আমেরিকানরা দুনিয়ার সবাইকে তোমাদের চাকর মনে করো। তা আমরা নই।'

সামলে নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কালাহান, নীরবে মাথা নাড়ল রানা।

'আর কোন কথা নয়, এবার কাজ। লাশগুলো পচে যাওয়ার আগেই বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তার আগে ছবি তুলতে হবে। সব শেষে ভেতরটা গোছাব আমরা, বসবাসযোগ্য করে তুলব।'

কেউ একটা কথাও বলল না। একটু আগের নাটকীয় ঘটনা সবার উপরেই গভীর প্রভাব ফেলেছে।

'ছবি আমি তুলছি,' বললেন ডক্টর হিতৈষী চক্রবর্তী। ব্যাগ খুলে একটা ৩৫ এমএম ক্যামেরা বের করলেন তিনি, কাজে লেগে পড়লেন।

ছবি তুলবার পর পরবর্তী এক ঘণ্টা লাগল লাশ সংগ্রহ করে সদর দরজার পাশে স্তূপ করে রাখতে। সাতাশজন মানুষ, ঠাঁই পেল বরফ আর তুষারের রাজ্যে। তাদের সঙ্গে যোগ দিল কপ্টার পাইলট আর ক্রু। রানা প্রত্যেকের নামধাম দেখে মিলিয়ে নিল। দু'জন বাংলাদেশী এবং একজন মালয়েশিয়ান বিজ্ঞানী এঁদের মধ্যে নেই। কোথায় তাঁরা? রাহাত খানের কথাগুলো মনে পড়ল ওর। তিনজন বিজ্ঞানী দুর্ঘটনার আগেই নিখোঁজ হয়েছেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতিভাবান। তাঁদের মধ্যে বাঙালী আছেন দু'জন। আপাতত মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল ও।

এবার ব্যস্ত হলো সবাই ভিতরটা বসবাসযোগ্য করতে। কাজটা শেষ করতে করতে বেজে গেল সন্ধ্যা ছ'টা।

রাবিতা আর ডক্টর হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন মিলে খাবার আর পানি পরীক্ষা শেষে কফি, সুপ আর স্যান্ডউইচ বানালেন। কর্নেল মাহমুদ ইন্সটলেশনের চীফের মদের কাউন্টার আবিষ্কার করেছেন, কয়েক বোতল ব্র্যান্ডি বিলি করলেন তিনি।

প্রধান বিল্ডিঙে ডে রুম, ডাইনিং হল, কিচেন, কয়েকটা ছোট অফিস, সাপ্লাই রুম এবং রেডিও আর মিটিওরোলজি রুম রয়েছে। পুরো বাড়িটাই ইতিমধ্যে যথেষ্ট উষ্ণ হয়েছে। গা থেকে বাইরের উপযুক্ত গরম কাপড় খুলে আরাম করে বসতে পারল সবাই।

ডাইনিং হলে জড়ো হয়েছে সবাই। কর্নেল তিব্বত জানালেন বেস ক্যাম্পের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করেছেন তিনি।

'কী ঘটেছে জানিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। টেবিলের সবাই কর্নেলের দিকে তাকাল।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলালেন কর্নেল। 'প্রাথমিক রিপোর্ট করেছি। সাপ্লাই রুমে প্যাথোলজি ল্যাব তৈরি করতে হবে, পরীক্ষা শেষে আবার রিপোর্ট করব।'

'এই বেসে ল্যাবোরেটরি নেই?' জিজ্ঞেস করল কালাহান।

'আছে,' ক্লান্ত শোনাল কর্নেলের গলা। 'কিন্তু মৃত্যুর কারণ কী ওই বন্ধ ল্যাবগুলোতেই লুকিয়ে আছে কি না সেটা আমরা জানি না। নিশ্চিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম এই বিল্ডিঙেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'

চুপ করে শুনছে সবাই, কারও কোন বক্তব্য নেই। কর্নেল আবার শুরু করলেন, 'ডক্টর র‍্যাচেল, সুং চ্যান আর মিস্টার জনসন অটোপসি করবেন। আমরা একটা একটা করে ইন্সটলেশনের সবগুলো ঘর পরীক্ষা করে দেখব। এই ক্যাম্পের প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে হবে, টুকে রাখতে হবে কী কী আছে।'

'কয়েক দিন লেগে যাবে তা হলে,' বলল কালাহান।

'লাগবে। আর কারও কোন প্রশ্ন?'

জিজ্ঞাসা নেই কারও।

'তা হলে আসুন খেয়ে নিই। যতো দ্রুত কাজ শেষ করা যাবে ততো দ্রুত এখান থেকে চলে যেতে পারব আমরা।'

পাঁচ

ডাইনিং হলটা সমস্ত কাজের কেন্দ্রস্থল নির্বাচিত হলো। খুঁজে খুঁজে নানা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা শেষে রাখা হতে লাগল ওখানে। সাপ্লাই রুমে প্যাথোলজি ল্যাব বসানো হলো। প্রথম তিনটে শরীর থেকে টিশু, রক্ত আর হাড়ের নমুনা নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল। রিপোর্ট পেতে অবশ্য দেরি হবে। ডক্টর র‍্যাচেল আর সুং চ্যান জানালেন আগামীকাল সকালের মধ্যে জানা যেতে পারে কী জিনিস ইন্সটলেশনের এতোগুলো মানুষকে খুন করেছে।

ইন্সটলেশনের ঘরগুলো একটা একটা করে ঘুরে দেখতে শুরু করল বাকিরা। হিটার ডাক্ট, পানি এবং সুয়ারেজ সিস্টেম চেক করে দেখা হলো। বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের ব্যক্তিগত জিনিস আর শীতের জন্য সংগৃহীত সাপ্লাইও পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ল না।

তিনজন বা চারজনের দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে সবাই। মাঝে মাঝে বিরতিতে ডাইনিং হলে যাচ্ছে কফি বা হালকা নাস্তার জন্য, তখন নিজেদের ভিতরে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আলাপ হচ্ছে।

কালাহানের উপরে চোখ রেখেছে রানা। লোকটার ছোঁক-ছোঁক করবার পদ্ধতি সত্যিই ভাল। গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে এক টেকনিশিয়ানের ব্যাগ ভর্তি গাঁজা খুঁজে বের করেছে সে। একজন বিজ্ঞানী নিজের খেয়ালখুশি মতো এক্সপেরিমেন্ট

চালাচ্ছিলেন, তাঁর ডায়রি আবিষ্কার করেছে। পেশাদারী দক্ষতা দেখাচ্ছে বোধহয়, মনে মনে হেসেছে রানা।

ডায়রিটা কালাহানের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সিজ করেছেন কর্নেল তিব্বত মাহমুদ। জানিয়েছেন, 'আমি পড়ার পরে ডক্টর হিতৈষী আর রাবিতাকে দেব। পড়ার পরে যদি তাঁরা বলেন ডায়রিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের তদন্তের মিল পড়ে, তা হলে সবাইকে পড়ার জন্যে দেব। তার আগে পর্যন্ত এটা মালয়েশিয়ান সরকারের সম্পত্তি।'

রানার মনে হলো খুব সহজেই মেনে নিল কালাহান। ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ও, প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে এখনও। সবারই নাভিশ্বাস উঠবার অবস্থা। অনেকক্ষণ আগেই রাত নেমেছে অ্যান্টার্কটিকার বুকে, বাড়ির বাইরে হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে চলেছে বাতাস, ক্রমেই বাড়ছে গতি।

ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ আর ডক্টর হিতৈষীর সঙ্গে কাজ করছে রানা। রাত দুটোর সময় খানিক বিশ্রাম আর কফির জন্য ফিরল ওরা ডাইনিং হলে। আগেই ওখানে উপস্থিত হয়েছে রাবিতা আর কালাহান, কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছে।

রাবিতা রানাকে দেখে ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পেলে, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা, মেশিন থেকে কাপ ভরে কফি নিয়ে সামান্য ব্র্যান্ডি ঢালল ওতে, তারপর রাবিতার উল্টোপাশে বসল। 'খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে, রাবিতা?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল মেয়েটা। 'শরীর ভেঙে আসতে চাইছে। হতাশাও ক্লান্তির একটা কারণ। ডক্টর র‍্যাচেল আর সুং চ্যানের সঙ্গে মাত্র কথা বলে এলাম।'

'কিছু বলল?'

'না। ডক্টর জনসন প্রধান পরীক্ষাগুলো করছেন। কিছু জানতে হলে আরও কয়েক ঘণ্টা অন্তত লাগবে...যদি আদৌ জানা যায়।'

'জানা যাবে না কেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা এতোগুলো মানুষকে খুন করেছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এমনও তো হতে পারে জিনিসটা আত্মবিধ্বংসী অরগানিজম।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ আর ডক্টর হিতৈষী। ভারতীয় ডক্টর বললেন, 'কর্নেল রানা, ডক্টর রাবিতা বলতে চাইছেন, যে জিনিস মানুষগুলোকে খুন করেছে, সেটা হয়তো দেহে ঢোকার নির্দিষ্ট সময় পরে মিলিয়ে গেছে, কোন চিহ্ন না রেখেই।'

'তা হলে তো জিনিসটা কী জানা যাবে না,' মন্তব্য করল কালাহান।

রানার দিকে তাকালেন ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ। রানাকেই ছাত্র হিসাবে পছন্দ হয়েছে। 'কিছুই জানা যাবে না সেক্ষেত্রে। এমনকী জিনিসটা কোন্ গ্রুপের, তা-ও নয়।' হাই তুললেন বিরাট একটা, মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'সারাদিন খুব ধকল গেছে। এবার বিশ্রাম না নিলেই নয়।'

'আমিও ঘুমাব একটু,' সায় দিলেন ডক্টর হিতৈষী। ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে গেলেন দুই বিজ্ঞানী।

'কর্নেল মাহমুদকে দেখেছ?' রাবিতাকে প্রশ্ন করল রানা।

'কিছুক্ষণ আগে এখানেই ছিলেন।'

'কোথায় গেছেন বলে গেছেন?'

মাথা নাড়ল রাবিতা, রানার দিকে তাকাল চোখে প্রশ্ন নিয়ে। 'বলছিলেন জেনারেটরের ফুয়েল সাপ্লাই চেক করবেন। হয়তো ওখানেই গেছেন। কেন?'

'অনেকক্ষণ দেখছি না।'

উঠল রাবিতা। 'ঘুমাতে চললাম।'

রানাও উঠল। 'চলো, তোমাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিই।'

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, করিডর ধরে চলে এলো সারি সারি ছোট ঘরগুলোর সামনে। সন্ধ্যার পর ওগুলো পরিষ্কার করেছে ওরা।

রাবিতার দরজার সামনে থামল রানা। মুচকি হাসল রাবিতা। 'আমি খুব ক্লান্ত, রানা, ঘুম দরকার।'

রানাও হাসল। আস্তে করে চুমু দিল রাবিতার কপালে। 'ঘুমিয়ে পড়ো। দরজা লক করতে ভুলো না। সকালে ডাক দেব।'

দরজা বন্ধ করে দিল রাবিতা, রানা চলে এলো নিজের ঘরে, শীতের পোশাক পরে নিয়ে ফিরে এলো করিডরে, বাইরে যাওয়ার দরজা খুলল। মুহূর্তে কাঁপ ধরে গেল অসহ্য শীতে। বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। তুষার পড়ছে ঘন হয়ে। পাঁচ ফুট দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাম্প লে-আউটের যে ডায়াগ্রাম দেখেছে সেই অনুযায়ী এগোল রানা। মেইন বিল্ডিঙের উল্টোদিকে জেনারেটর বিল্ডিং, রেডিও অ্যান্টেনার পাশে। দূরত্ব একশো গজের বেশি হবে না, কিন্তু ওই দূরত্বই বিরূপ পরিবেশের কারণে প্রায় অনতিক্রম্য।

তীব্র বাতাস ঠেলে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল রানা, পিছনে তাকিয়ে দেখল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের বরফে ভরা জানালাগুলোর কাঁচ আলোকিত। একটা জানালায় সামান্য নড়াচড়া দেখতে পেল। সম্ভবত কালাহান অথবা প্যাথোলজি ল্যাবের কেউ।

উড়ন্ত তুষারের ভিতর দিয়ে সামনে দেখবার চেষ্টা করল রানা। রেডিও অ্যান্টেনা অথবা জেনারেটর বিল্ডিঙের ছাদের আলো চোখে পড়ল না। শুধু ঘন অন্ধকার।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে থেকে জেনারেটর বিল্ডিং পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। পথটা খুঁজে পেলে অপেক্ষাকৃত সহজে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। সাবধানে থাকতে হবে, নইলে এই আবহাওয়ায় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বাড়ির কোনা ঘুরল রানা, সামনের দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, মাত্র কয়েক ফুট বাকি, এমন সময় হোঁচট খেল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল তুষারে অর্ধেক ডুবে থাকা মোটা একটা দড়িতে পা বেধেছে। দড়িটা তুলল রানা, সামান্য এগোতেই দেখতে পেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সঙ্গে দড়িটা যুক্ত।

এটা কি জেনারেটর বিল্ডিঙে যাওয়ার গাইডলাইন? তা-ই হবে। আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন ক্রুদের নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময় পরপর জেনারেটর পরীক্ষা করবার দরকার পড়ত। দুটো বাড়ির মাঝখানে সংযোগ দিয়েছে দড়ির, যাতে ওটা ধরে পথ চললে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

কোমর সমান উচ্চতায় দড়িটা দু'হাতে ধরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং পিছনে ফেলে ঝড়ো বাতাসের ভিতর দিয়ে এগোল রানা। সরু একটা পথ আছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগটাই ডুবে গেছে নরম তুষারে। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে রানাকে, তুষারের তলা থেকে দড়ি টেনে তুলে নিয়ে এগোচ্ছে আবার। সামনে গাঢ় আঁধার ছাড়া আর কিছু নেই। একবার থেমে পিছন দিকে তাকাল ও, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের আলো আর দেখতে পেল না। চারপাশে তাণ্ডব নাচ চলেছে ঝড়ো হাওয়ার, গতি বাড়ছে আরও।

এক ঘণ্টা বুঝি পার হয়ে গেছে, মনে হলো রানার। তবে জানে, পনেরো মিনিটের বেশি হয়নি ও বেরিয়েছে। আরও খানিকটা সামনে যাওয়ার পরে ঝাপসা একটা হলুদ আলো দেখতে পেল। অপার্থিব মনে হচ্ছে সামান্য আলোটুকু।

হাঁটবার গতি বাড়াল রানা, দশ গজ পেরিয়েই পৌঁছে গেল জেনারেটর বিল্ডিঙের সদর দরজায়। দরজাটা খুলতেই ডিজেল ইঞ্জিনের জোরাল আওয়াজ শোনা গেল স্পষ্ট।

ভিতরে ঢুকল রানা। মস্ত বড় একটা ঘর। মেঝেতে বল্টু দিয়ে আটকানো একটা জেনারেটর চালু আছে। পাশের ব্যাকআপ ইউনিট নীরব। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পার্কার চেইন খুলল ও, হুড

সরিয়ে দিল। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারল এখন কেউ না থাকলেও বেশিক্ষণ হয়নি এখানে কেউ ছিল। দরজার কাছ থেকে ভিতরের দিকে চলে গেছে গলা তুষারের পানির দাগ। অনুসরণ করল রানা। বাড়তি জেনারেটর পাশ কাটিয়ে ঘরের কোনার দিকে বড় একটা কেবিনেটের সামনে থেমেছিল লোকটা। হ্যান্ডেল ঘুরাল রানা, লক করা।

কর্নেল মাহমুদ এসেছিলেন সম্ভবত, কেবিনেটের কিছু পরীক্ষা করে দেখে চলে গেছেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের জানালায় হয়তো তাঁকেই দেখেছে ও। কিন্তু এখানে উনি কী করছিলেন?

তালাটা পরীক্ষা করতে সামনে ঝুঁকল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে উঠল কেবিনেটের হ্যান্ডেল, খুলে যেতে শুরু করল পাল্লা। মাথায় বাড়ি খেল রানা, চট করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার।

কেবিনেট থেকে বের হয়ে এলেন কর্নেল তিব্বত মাহমুদ, রানাকে দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তাঁর।

'আপনি কি সবসময় এরকম ভাবে কেবিনেটে ঢুকে থাকেন, কর্নেল?' হাসল রানা, ওয়ালথার পকেটে ভরে রাখল।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকালেন কর্নেল, চেহারায় অপরাধী-অপরাধী একটা ভাব। 'আমি...'

'ভেতরে কী আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এমন কিছু যেটা আমার জানা দরকার? অন্যরা কোন আপত্তিকর প্রশ্ন করবে এমন কিছু?'

বড় করে শ্বাস ফেললেন কর্নেল মাহমুদ। 'সবই তো আপনি জানেন প্রায়, কাজেই আপনার কাছে লুকাব না।' কেবিনেটের দরজা পুরো খুলে দিলেন কর্নেল। ঘুরে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। 'আসুন,' ডাক দিলেন।

অনুসরণ করল রানা, কেবিনেটের পিছনে কী যেন করছেন কর্নেল। পিছনের দেয়ালটা এক পাশে সরে গেল, বেরিয়ে এলো

এক সার সিঁড়ি।

'গোপন ঘর,' সামনে বাড়লেন কর্নেল। 'পেছনের দরজাটা আপনাআপনি তালাবন্ধ হয়ে যাবে।' নামতে শুরু করলেন সিঁড়ি বেয়ে। রানাও একেক বারে দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামল তাঁর পিছনে, নেমে এলো জেনারেটর বিল্ডিঙের ত্রিশ ফুট নীচে।

মেঝেতে পৌঁছে বাতি জ্বাললেন কর্নেল, উজ্জ্বল সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হলো একটা খুপরি। একদিকে স্টিলের একটা দরজা। কয়েকটা সংখ্যা টিপে তালা খুললেন কর্নেল মাহমুদ, ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে দরজাটা সরিয়ে দিলেন, ভিতরে ঢুকে বাতি জ্বাললেন সুইচ টিপে।

'ইন্সটলেশন তৈরি করার সময় বরফের গভীরে খুঁড়ে ঘরটা বানানো হয়,' জানালেন। 'এটার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে জেনারেটর বিল্ডিং।'

ঢুকল রানাও। বিরাট একটা ঘর, এক সময় বোধহয় ল্যাবোরেটরি ছিল। এখন একটা যন্ত্রপাতিও আস্ত নেই। গ্লাস বিকার আর কেমিকেলের টুকরো টাকরা পড়ে আছে পুরো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

একপাশের দেয়াল লাগোয়া ফাইল কেবিনেটগুলোর দরজা খোলা। ল্যাবের সিঙ্কে ছাই দেখতে পেল রানা। ফাইলগুলো পোড়ানো হয়েছে।

'আপনার কাজ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন কর্নেল। 'উপায় ছিল না আর কোন। তথ্যগুলো কারও হাতে পড়ুক সে-ঝুঁকি আমি নিতে পারতাম না।'

ফাইল কেবিনেটের দিকে পা বাড়াল রানা।

'আর কিছু নেই ওখানে,' পিছন থেকে বললেন কর্নেল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'কী কাজ হতো এখানে, কর্নেল?'

'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। ওপরের মতোই। কিন্তু এখানেই রাখা ছিল আসল ভাইরাসটা। ওগুলোর ওপর পরীক্ষা করা

হচ্ছিল। বায়োলজিকাল উইপন আর তার অ্যান্টিডোট তৈরির চেষ্টা চলছিল। আরভিবি-এ ভাইরাস। চুরি হয়ে গেছে ওই ভাইরাসের কন্টেইনারগুলো।'

'আরভিবি-এ?'

'র‍্যাপিড ভ্যারিয়িং বায়ো-এজেন্ট,' শুকনো গলায় ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল। 'পশ্চিমা বিশ্বের জিনিস। পরে আরও উন্নত করা হয়। বাঙালী বিজ্ঞানীদের অবদান। জিনিসটা প্রয়োজন হলেই নিজের আকার আকৃতি বদলে নিয়ে ইমিউন সিস্টেমকে ফাঁকি দেয়। মৃত্যুটা হয় খুব যন্ত্রণাদায়ক। যেভাবে মারা গেছে আমাদের লোকরা।'

'কোনও অ্যান্টিডোট নেই?'

হাসবার চেষ্টা করলেন কর্নেল। 'না। তৈরির চেষ্টা চলছিল। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে তাঁরা অ্যান্টিডোট আবিষ্কার করতে পারবেন।'

'আপনার মতামত বলুন। কী ঘটেছিল ইন্সটলেশনে?'

'সম্ভবত আরভিবি-এ সংক্রমণ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কর্নেল। 'বাইরে থেকে কেউ আরভিবি-এ ছড়িয়ে দিয়েছে—এ ছাড়া তো আর কিছু আমার মাথায় ঢুকছে না। খুন করা হয়েছে সবাইকে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রানা বলল, 'কে? এবং কেন?'

'জানি না।'

'আরভিবি-এর কোন চিহ্ন ভিক্টিমের শরীরে থাকে না?'

'না।' রানার চোখে তাকালেন কর্নেল। 'এখন? কী করবেন ভাবছেন?'

'আগে জানতে চেষ্টা করব কাজটা কাদের। দুর্ঘটনা হতে পারে না। চুরি হয়েছে জিনিসগুলো। নইলে ভাইরাসের কন্টেইনারগুলো থাকত। কালাহানকে নজরে রাখতে হবে। আমেরিকানরাও জড়িত হতে পারে। লোকটার মাধ্যমে হয়তো জানা যাবে কী ঘটেছিল।'

'আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল, কর্নেল রানা,' বললেন কর্নেল মাহমুদ। 'একশো দশ মাইল দূরে একটা ইন্সটলেশন আছে। ওয়েদার ইন্সটলেশন এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টার। ব্যক্তিমালিকানাধীন। ওখানে খোঁজ নিয়ে জানা দরকার আরভিবি-এর আক্রমণের শিকার হয়েছে কি না তারা।'

অন্য খাতে চিন্তা চলছে রানার, বলল, 'ধরা যাক যে বা যারা আরভিবি-এ চুরি করেছে তারা জিনিসটা পাচার করতে চাইছে। তা হলে কী করবে, জাহাজে করে সরিয়ে নেবে?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'না। জাহাজ আসার সময় শেষ।'

'সাবমেরিন?'

এক মুহূর্ত ভাবতে হলো কর্নেলকে। 'সম্ভব।'

'কোথায়?'

'কোথায় মানে?'

'আরভিবি-এ কোথায় সাবমেরিনে ওঠাবে?'

'তীরের যে-কোন জায়গায়...' বলতে শুরু করেও থেমে গেলেন কর্নেল মাহমুদ। 'না। সাউন্ডের ধারে-কাছে আসবে না। তা হলে আমরা জেনে যেতাম। আমেরিকানদের অগোচরেও ওখানে কিছু করতে পারা যাবে না। রস্ সাগরেও না। ওসব জায়গায় এয়ার ট্রাফিক অনেক বেশি।'

'তা হলে ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের পুব বা পশ্চিমে জিনিসটা হাত বদল হবে।'

'ঠিক কী ভাবছেন, কর্নেল রানা?'

জবাব দিল না রানা। 'আপনার কাছে ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের বিস্তারিত কোনও ম্যাপ আছে?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে কমান্ডারের অফিসে আছে।'

'চলুন, ওটা দেখতে হবে। মনে হচ্ছে সমস্যা সমাধানের পথে এগোচ্ছি আমরা।' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

দু'জন একই সঙ্গে ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো, সিঁড়ি বেয়ে

উঠে কেবিনেট পার হয়ে জেনারেটর বিল্ডিং থেকে বের হলো, পার্কার চেইন টেনে দিতে ভোলেনি।

আগের চেয়েও গতি বেড়েছে বাতাসের। তুষারপাত আরও ভারী হয়েছে। তুষার-ঝড়ের বাধা ঠেলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে পৌঁছাতে বিশ মিনিট লেগে গেল ওদের।

খাঁ-খাঁ করছে ডে রুম আর ডাইনিং হল। সবাই বোধহয় তলিয়ে গেছে ঘুমের অতলে। সারাদিন কম খাটনি যায়নি। কর্নেলের সঙ্গে ইন্সটলেশন কমান্ডারের অফিসে চলে এলো রানা। বাতি জ্বেলে দরজা বন্ধ করলেন কর্নেল।

কমান্ডারের ডেস্কের পিছনে দেয়াল জুড়ে অ্যান্টার্কটিকার বিরাট একটা ম্যাপ ঝুলছে। ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'একটা রুলার দিন,' পিছন না ফিরেই বলল। 'সোজা কিছু একটা হলেও চলবে।'

একটা স্কেল টেবিলে পেয়ে ওটা রানাকে দিলেন কর্নেল।

ম্যাপে ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের আশেপাশের কয়েকশো মাইলের ভিতরে বিভিন্ন ইন্সটলেশনের অবস্থান দেখানো হয়েছে। আমেরিকান বেস ক্যাম্প আর কর্নেলের বলা ব্যক্তিমালিকানাধীন ইন্সটলেশনটা রানার নজর কাড়ল। ওগুলো পঞ্চাশ মাইল দূরত্বে পাশাপাশি। ওগুলোতে স্কেলের একটা প্রান্ত রেখে পুবের তীরে আরেকটা প্রান্ত বসাল রানা। দুটো থেকেই মার্য গ্ল্যাসিয়ারের জিভটা মোটামুটি কাছে। এই মালয়েশিয়ান রিসার্চ ইন্সটলেশনের থেকেও ষাট মাইলের বেশি দূরে হবে না জায়গাটা।

রানা কী ভাবছে বুঝতে পেরেছেন কর্নেল, বললেন, 'না; অনেক বেশি দূরত্ব হয়ে যায়।'

ম্যাপ থেকে চোখ তুলল রানা। ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল।

'যদি ভাইরাসটা এখান থেকে চুরি করে ওসব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলে এই ইন্সটলেশনে ওটার সংক্রমণ হওয়ার কথা নয়। দূরত্ব বড় বেশি। এই আবহাওয়ায়

আরভিবি-এ এতোদূরে আসতে পারবে না।'

'কতোটা ছড়াতে পারবে?'

'দশ-পনেরো মাইল বড়জোর। স্বাভাবিক আবহাওয়া পেলে হাজার মাইলও কিছু না, কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় তা সম্ভব নয়।'

ম্যাপের দিকে আবারও তাকাল রানা। তা হলে নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেওয়া যায় এখান থেকে চুরি করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। জিনিসটা পনেরো মাইল বৃত্তের মধ্যেই আছে বা ছিল কোথাও। 'কর্নেল,' মুখ তুলে তাকাল রানা। 'এয়ার সার্চ করতে হবে আমাদের।'

মাথা নাড়লেন মালয়েশিয়ান কর্নেল। 'সম্ভব নয় এই আবহাওয়ায়।'

'তা হলে বেস ক্যাম্পে খবর দিন, তারা যাতে উপকূলের দিকে নজর রাখে। কেউ না কেউ সাবমেরিন নিয়ে আসবেই। সময় মতো খবরটা জানতে চাই আমি।'

একমুহূর্ত দ্বিধা করলেন কর্নেল মাহমুদ, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। মেসেজটা পাঠিয়ে দেব। তবে তাতে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। ওয়েদার ফোরকাস্টাররা জানিয়েছে ঝড় বাড়বে আরও, চলবে অন্তত টানা তিন-চার দিন।'

'যতোটা পারি করব আমরা,' বলল গম্ভীর রানা। 'প্রাইভেট ওয়েদার এবং স্পেস রিসার্চ ইন্সটলেশনেও একটা রেডিও মেসেজ পাঠানো দরকার। ওখানে কিছু হয়েছে কি না তা জানতে হবে।' ম্যাপের সামনে থেকে সরে পা বাড়াল ও দরজার দিকে। 'গুডনাইট, কর্নেল।'

'গুড নাইট,' পিছন থেকে বললেন কর্নেল। 'মেসেজটা পাঠিয়ে দিয়ে আমিও একটু ঘুমিয়ে নেব।'

বেরিয়ে এলো রানা ঘর ছেড়ে।

ছয়

দু'ঘণ্টা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল রানা, ঘুম এলো না। কর্নেল তিব্বত মাহমুদের কথাগুলো ঘুরেফিরে আসছে মাথায়। আরভিবি-এ লাগামহীন কারও হাতে পড়বার অর্থ হচ্ছে লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের অকারণ মৃত্যু।

খামোকা এপাশ-ওপাশ না করে উঠে পড়ল ও, ঠিক করল বিসিআইতে বর্তমান পরিস্থিতি রিপোর্ট করবে।

রেডিও এবং মিটিওরোলজির ঘরটা কমান্ডারের ঘরের ঠিক পাশে। প্রতিটা ইকুইপমেন্ট অন করা, গুঞ্জন করছে, কিন্তু কর্নেল মাহমুদ নেই। বোধহয় যতোদ্রুত সম্ভব এয়ার সার্চের নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, তারপর বিছানায় গেছেন। কিন্তু তা হলে রেডিও চালু রেখে যাবেন কেন?

ইকুইপমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, টেবিলে রাখা একটা ট্র্যান্সিভারের সামনে ক্লিপবোর্ডে ছোট একটা কোডেড মেসেজ দেখতে পেল। কর্নেলের মেসেজ। কিন্তু এটা এখানে ফেলে রেখে গেছেন কেন? ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। রিসিভারের ভলিউম বাড়াল, খড়খড়মড়মড় আওয়াজ ছাড়ল ওটা। জিনিসটা ঠিক আছে বলেই মনে হলো, তবে অন্য প্রান্তে কোন সিগনাল নেই।

জানালা থেকে বরফ সরিয়ে বাইরে অ্যান্টেনা টাওয়ারের দিকে তাকাল রানা। ঝড় বইছে বাইরে। কিছুই দেখা গেল না। এমনও

হতে পারে অ্যান্টেনা নিয়ে কোন সমস্যা হয়েছে, কর্নেল গেছেন সেটা ঠিক করতে। কিন্তু ব্যাখ্যাটা নিজের কাছেই পছন্দ হলো না ওর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো মনের ভিতরে।

বিসিআইতে রিপোর্ট করতে চেষ্টা করল, করা গেল না। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। এবার কর্নেলের মেসেজটা ছিঁড়ে পকেটে রেখে দিয়ে ডে রুম আর ডাইনিং রুম ঘুরে দেখল। কোথাও কেউ নেই। প্যাথোলজি ল্যাবও ফাঁকা। ঘুমাচ্ছে বোধহয় সবাই।

কর্নেল মাহমুদের ঘরের দরজায় কান পাতল ও, তারপর আস্তে করে নক করল। জবাব দিল না কেউ। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল, কর্নেল নেই। বিছানা পরিপাটি, রাতে শোয়নি কেউ। কর্নেলের পার্কাও নেই।

নিজের ঘরে ফিরল ও, পার্কা পরে নিয়ে ডে রুম হয়ে বেরিয়ে এলো বিল্ডিং থেকে। বাতাস তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ করছে। ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল বেগে বইছে এখন। তুষারপাত এতো বেড়েছে, সামনে দু'ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না।

দরজার সামনে থেকে দড়িটা খুঁজে বের করে এগিয়ে চলল জেনারেটর বিল্ডিং আর রেডিও অ্যান্টেনার দিকে। কাজটা ঠিক করছে কি না বুঝতে পারছে না রানা। রেডিও অ্যান্টেনা যদি ম্যালফাংশান করেই থাকে তা হলে কর্নেল কী করবেন? এই ঝড়ের ভিতরে কী করবার আছে তাঁর?

প্রচণ্ড দমকা বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলেই হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কোনমতে সামলে নিল। মাথা নিচু করে সামনে বাড়ল আবার। অ্যান্টার্কটিকার পোশাকও ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। কাঁপছে ও ঠকঠক করে। প্রচণ্ড বাতাস তীব্র বাধা সৃষ্টি করছে। একশো গজ যেতে আধঘণ্টার বেশি লাগল। মাথায় জেনারেটর বিল্ডিঙের দেয়ালের ঠোকর খেয়ে বুঝল গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল সাবধানে। দড়িটা ছেড়ে দেয়ালে হাত রেখে রেখে দরজার কাছে হাজির হলো। দরজা খুলে ঢুকল

ভিতরে। জেনারেটর ঠিকই চলছে, কিন্তু কর্নেল আর আসেননি এখানে। গরম ঘরে কয়েক মিনিট থাকল রানা, তারপর বাইরে বের হলো আবার।

দরজা থেকে কোনাকুনি সামান্য দূরত্বে রেডিও অ্যান্টেনার টাওয়ার, পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এতক্ষণ বাড়ির আড়াল পাচ্ছিল রানা, কোনা ঘুরতেই তীব্র বাতাসের অতর্কিত হামলার মুখে পড়ে গেল। আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেত। সামলে নিয়ে নিচু হয়ে এগোল আবার, বিল্ডিংটাকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করছে।

তিরিশ ফুট যাওয়ার পরে রেডিও টাওয়ারের গোড়ায় পৌঁছল ও। উপরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। কোন আলো জ্বলছে না। প্রথমে মনে করেছিল ঝড়ের কারণে লালবাতি দেখতে পাচ্ছে না, তারপর টের পেল কী যেন একটা অস্বাভাবিক।

টাওয়ারের মই বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল ও। পাঁচ ফুটও ওঠেনি, জেনারেটর বিল্ডিঙের ছাদ এখনও আরও উঁচুতে, এমন সময় দেখতে পেল উপরে টাওয়ার নেই, তার বদলে আছে মোচড়ানো কয়েকটা স্টিলের খুঁটি। ভেঙে পড়েছে টাওয়ার।

চট করে নেমে পড়ল রানা, বাতাস ঠেলে চলে এলো ভাঙা টাওয়ারের কাছে। দুটো টানা দেওয়ার স্টিলের কেব্‌ল্ দেখল, পড়ে আছে। ও দুটো অনুসরণ করে শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। পকেট থেকে টর্চ বের করে ওটার আলোয় কেব্‌ল্ দুটো পরীক্ষা করে দেখল। শেষ মাথা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে যায়নি, ধারাল কিছু দিয়ে কাটা হয়েছে কেব্‌ল্ দুটো।

কেউ একজন এখানে এসে কেবল কেটে দিয়েছে। এমন কেউ, যে চায় না মালয়েশিয়ান বেস ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করবার উপায় থাকুক। কালাহান? আমেরিকানদের কী লাভ তাতে?

পকেটে টর্চ রেখে দিল রানা, বের করল ওয়ালথারটা। গ্লাভস পরা হাতে সেফটি ক্যাচ অফ করতে ঝামেলা পোহাতে হলো।

এগোল আবার।

রেডিও টাওয়ারের ভাঙা টুকরোর তলায় পড়ে আছেন কর্নেল তিব্বত মাহমুদ। টাওয়ারের চাপা খেয়েছেন মৃত্যুর আগে। চারপাশের বরফে রক্তের ছোপ। মুখটা থেঁতলে গেছে একেবারে, চেনা যায় না।

টাওয়ারে উঠেছিলেন, এমন সময় কেউ কেবলগুলো কেটে দেয়। উপর থেকে পড়ে গিয়ে অথবা টাওয়ারের চাপে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ভুল করেছে বুঝে ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। আসবার আগে উচিত ছিল অন্যদের ঘরগুলো দেখে আসা। রেডিও টাওয়ারের দুর্ঘটনা একঘণ্টা আগেও ঘটে থাকতে পারে। তার মানে কাজটা যে করেছে সে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে।

টাওয়ারের যে অংশ কর্নেলকে থেঁতলে দিয়েছে সেটা বরফের ভিতরে গেঁথে আছে। চেষ্টা করতে গিয়ে রানা বুঝল ওর একার পক্ষে টাওয়ার তুলে কর্নেলকে টেনে বের করা সম্ভব নয়। ঝড় থেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত লাশটা এখান থেকে সরানো যাবে না।

জেনারেটর বিল্ডিঙের দিকে এগোল রানা হামাগুড়ি দিয়ে। সামনে হঠাৎ একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। থামল ও। একটু পরেই আরেকটা ইঞ্জিন চালু হলো। জ্বলে উঠল দু'জোড়া হেডলাইট। এরাই কি টাওয়ারটা ধসিয়ে দিয়েছে? না হলে আর কারা?

স্নো-ক্যাট। এই ঝড়ের ভিতরেও বেরিয়েছে লোকজন। তারা মালয়েশিয়ান রিসার্চ ইন্সটলেশনের কেউ হতে পারে না। এই আবহাওয়ায় কারও এদিকে আসবার কথাও নয়। বাড়ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ, এগিয়ে আসছে ওগুলো। ওয়ালথার তুলেই এক জোড়া হেডলাইটের উপরদিক লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। মনে হলো মেশিনটা ওর দিকেই তেড়ে আসছে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল ওটার। হেডলাইট এখনও জ্বলছে।

দ্বিতীয় মেশিনটা ছুটে এলো রানার দিকে। আরও দুটো গুলি করল রানা ওটার হেডলাইট লক্ষ্য করে।

ওর মাথার ছ'ইঞ্চি দূরে টাওয়ারের স্টিলে বাড়ি খেয়ে বিইইইং করে পিছলে গেল একটা বুলেট। ডানদিকের পাঁজরের হাড়ে তীব্র জ্বালা অনুভব করল রানা, এক পাশে কাত হয়ে গড়ান দিয়ে উঠে বসল। ততোক্ষণে রওনা হয়ে গেছে দুটো মেশিন, দ্রুত গতিতে ঝড়ের ভিতরে ঢুকে গেল, দেখা গেল না আর। বাতাসের দাপটের মাঝে কমে এলো ইঞ্জিনের আওয়াজ, মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। স্নো-ক্যাট দুটো যেদিকে গেছে সেদিক লক্ষ্য করে আরও চারটে গুলি করল রানা, তারপর পকেটে রাখল ওয়ালথারটা।

কালাহান নয়, বুঝতে পারছে রানা, কিন্তু তার পক্ষের লোক। আমেরিকান বেস থেকে এসেছিল তা হলে। কেন? টাওয়ার ধ্বংস করতে। এক নম্বর কপ্টারের পাইলটের কথা মনে পড়ল ওর। নীচে নড়াচড়া দেখেছিল সে। সম্ভবত এরাই তারা। কী স্বার্থ আমেরিকানদের? জানা নেই ওর। এখান থেকে ভাইরাস সরানো হয়েছে সেটা কি কালাহান তাদের কোনভাবে জানিয়ে দিয়েছে? নিজেরা আরও লোক নিয়ে তদন্ত করতে চাইছে তারা?

আবার টাওয়ারের গোড়ায় ফিরে এলো রানা, জেনারেটর বিল্ডিং ঘুরে চলে এলো দরজার সঙ্গে বাঁধা গাইড লাইনের কাছে। ডানদিকের পাঁজরের হাড়ে যেন আগুন ধরে গেছে ওর, শীতে কাঁপছে ও থরথর করে। আশা করল বুলেট শুধু চামড়া ছিলে বেরিয়ে গেছে। দড়ি ধরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের ফিরতি পথে এগোল।

দু'বার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল কাত হয়ে। উঠল দু'বারই। দ্বিতীয়বার হাতের দড়িটা ঢিলে ঠেকল। টান দিতেই সরসর করে চলে আসতে শুরু করল দড়িটা। কী ঘটেছে বুঝতে দেরি হলো না ওর। হয় ছিঁড়ে গেছে, নয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

বিল্ডিঙের সঙ্গে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে কেউ। দীর্ঘক্ষণ ওখানেই বসে থাকল ও, তারপর পিছনে তাকাল। ওদিকে টান দিতেই শক্ত হয়ে উঠল দড়ি। জেনারেটর বিল্ডিঙের সঙ্গে এখনও ওটা যুক্ত।

শীতের কারণে চিন্তাভাবনা ভোঁতা হয়ে আসছে। আরও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে হাঁটু মুড়ে বসে থাকল রানা, হাতে শিথিল দড়ি, তারপর পিছনের দড়িটা টানটান করে সামনে এগিয়ে চলল আবার। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং থেকে খুব দূরত্বে যদি দড়িটা কাটা না হয়ে থাকে তা হলে ওটা ধরে ধরে কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারবে ও, সামনে হাঁটতে থাকলে বাড়িটার দেয়ালে ধাক্কা খাবে কপাল ভাল হলে।

দশ মিনিট পর দড়ি শেষ প্রান্তে পৌঁছল রানা। এবার বুঝতে দেরি হলো না, ধারাল কিছু দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে দড়িটা। শেষ মাথা ধরে আরও এগোল ও, দড়িটা টানটান হওয়ার পরে গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সামনে তাকাল আলোর দেখা পাওয়ার আশায়। নেই কোন বাতি।

উরু সমান উঁচু তুলোর মতো নরম তুষারে পথটা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। হারিয়ে গেছে ও, বুঝতে পারল রানা। ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও হলো না। দড়ি ছেড়ে দিয়ে সামনে বাড়লে এমন সম্ভাবনা খুবই বেশি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং পাশ কাটিয়ে যাবে ও। আবহাওয়া এখন যেমন তাতে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না, ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যু হবে।

যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকে তাকাল রানা। দড়ি অনুসরণ করে আবার ফিরে যেতে হবে জেনারেটর বিল্ডিঙে। ওখানে অন্তত ঝড় আর বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আরাম করে বিছানায় শোয়া হবে না তাতে, কিন্তু বাঁচবে অন্তত।

ঘুরে বসে দু'ফুটও যায়নি ও, ওদিকেও দড়িটা ঢিলে হয়ে গেল। থামল ও। স্নো-ক্যাটে যারা ছিল তারা ফিরে এসে দড়িটা

জেনারেটর বিল্ডিঙের দরজা থেকে কেটে দিয়েছে। এখনও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে তারা, দৃষ্টি আড়ালে ক্যাম্প করেছে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে গিয়ে সবাইকে সতর্ক না করলে একেবারেই অরক্ষিত অবস্থায় মারা পড়বেন বিজ্ঞানীরা। বোঝাই যায়, যারা বাইরে আছে তাদের তাড়া নেই কোন, পছন্দ মতো সময়ে একজন একজন করে সবাইকে খুন করতে পারবে।

আবার ঘুরে বসল রানা, দড়িটা ফেলে দিয়ে ওর ধারণা অনুযায়ী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং যেদিকে থাকবার কথা এগোল সেদিকে। একেকবারের চেষ্টায় আধ ফুটের বেশি যেতে পারছে না। মাঝে মাঝেই থামছে আলোর দেখা পাওয়ার আশায়। মুখের সামনে উড়ন্ত তুষার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কতোক্ষণ এভাবে কেটেছে বলতে পারবে না, মনে হলো যেন অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ একটা আলো দেখতে পেল। ঝাপসা। খানিকটা বামে। ওইদিকেই এগোল রানা।

কয়েক ফুট যাওয়ার পরে আর দেখতে পেল না বাতিটা। মনের ভিতর সন্দেহ দোলা দিল। ঠিক দেখেছিল ও? কিন্তু না, আবার দেখা গেল ঝাপসা আলো। যতোটা দ্রুত সম্ভব ওদিকে এগিয়ে চলল রানা।

হ্যাঁ, বাতি। ছোট একটা জানালা থেকে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছে গেল রানা। ডানে বামে কিছু দেখা যাচ্ছে না, সব অন্ধকারে মিশে গেছে, কিন্তু জানালার আলোটা এখন আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট।

ওটার সামনে গিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ক্লান্তিতে চোখে আঁধার দেখছে। বুঝতে পারল বেশিক্ষণ আর টিকবে না এই ঠাণ্ডায়। জমে গেছে যেন হাত-পা।

পুরু বরফ-জমা জানালার কাঁচে টোকা দিল ও, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কে যেন ওদিকে এসে দাঁড়াল।

আবার টোকা দিল ও। কে যেন বরফ সরিয়ে ছোট একটা

গোল জায়গা পরিষ্কার করে তাকাল কয়েক মুহূর্ত দু'জনের চোখ তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে, তারপর জানালার কাঁচ একপাশে সরে গেল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল রানা। শরীরে একবিন্দু জোর পাচ্ছে না। মনে হলো জ্ঞান হারাবে। তবুও বুঝতে পারল, যে তাকিয়েছে সে যদি কালাহান হয় তা হলে সাহায্য করবে না, বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে।

একেকটা মিনিট যেন একেকটা ঘণ্টা। কে যেন রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। মুখ তুলল রানা, ডক্টর র‍্যাচেল বনেটকে দেখতে পেল।

'আপনি অনেক বেশি ভারী,' বাতাসের হুঙ্কার ছাপিয়ে উঠল মেয়েটির রিনরিনে কণ্ঠ। 'একটু সাহায্য করুন!'

কী করে নিজেও বলতে পারবে না রানা, উঠে দাঁড়াল ও। টলছে মাতালের মতো। ডক্টর র‍্যাচেলের কাঁধে ভর দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এলো; বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে দরজায় পৌঁছে গেল। ভিতরে ঢুকল ওরা। দম নিতে থামল কয়েক মিনিট, তারপর ডক্টর র‍্যাচেল করিডর ধরে তার ঘরে যেতে ওকে সাহায্য করল। বিছানায় রানাকে বসিয়ে দিয়ে গায়ের পার্কা খুলে ফেলল, রানারটাও খুলে দিল।

'কী করছিলেন আপনি বাইরে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। তারপর দেখতে পেল রানার পাঁজরে রক্ত। 'জিসাস!' চোখ বিস্ফারিত হলো মেয়েটার। দ্রুত পায়ে ঘরের কোণ থেকে মেডিকেল কিট নিয়ে এলো।

ব্যস্ত হাতে রানার শার্ট খুলে ফেলল র‍্যাচেল, কাঁচি দিয়ে কাটল থার্মাল আন্ডারওয়্যার, তারপর ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ক্ষতটা পরীক্ষা করে বলল, 'গুলি করা হয়েছে আপনাকে!'

পাঁজরের দিকে তাকাল রানা। চামড়া নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়, কিন্তু তারই মাঝে দগদগে লাল একটা দাগ। চামড়া-মাংস ছিলে

হাড় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

'বাঁচব তো?' ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কার কাজ?' ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল র‍্যাচেল, দু'হাত ব্যস্ত ওষুধের বোতল খুলতে। তুলোতে তরলটা দিয়ে রানার পাঁজরে লাগাবার আগে বলল, 'জ্বলবে কিন্তু।'

দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল রানা। ক্লান্তি আর জ্বলুনির চোটে চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল পুরো ঘর।

তরলটা মাখিয়ে দেওয়ার পরে ফার্স্ট এইড কিট থেকে মলম বের করে মাখল র‍্যাচেল, তারপর শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধল। কাজ সেরে বলল, 'আপনার কপাল ভাল, একটা হাড়ও ভাঙেনি। তবে একটাতে বোধহয় চিড় খেয়েছে।' চুপ করে আছে রানা। এবার স্টেথিস্কোপ কানে দিয়ে রানার হৃৎস্পন্দন শুনল র‍্যাচেল।

রানার মনে হলো ঘরের আলো ক্রমেই কমে আসছে। আগের চেয়ে বেশি শীত লাগছে। ঘরের ভিতরেও কাঁপুনি উঠে গেল, মনে হলো বাইরের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা।

'হাইপোথারমিয়া,' স্টেথিস্কোপ সরিয়ে যেন নিজেকেই বলল র‍্যাচেল। হাত ধরে রানাকে টেনে দাঁড় করাল, তারপর এক হাতে বিছানার কভার সরিয়ে রানাকে বসিয়ে দিল। শুতে বাধ্য করল এরপর। বুট আর মোজা খুলে দিল।

রানার মনে হলো ছোট্ট একটা বাচ্চা ও, শুয়ে আছে নার্সের কোলে। এতো দুর্বল লাগছে...এতো শীত...মাথা ঘুরছে...দৃষ্টি ঘোলা...কী হচ্ছে সচেতন ভাবে বুঝতেও পারছে না ও।

ওর অবস্থা বুঝতে পেরেছে ডক্টর র‍্যাচেল। আস্তে করে রানার পাশে বসে পড়ল সে, মুখে মৃদু হাসি। তার দু'হাত ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

'না,' বাধা দিতে চাইল রানা।

'বাদ দিন,' মৃদু হাসল র‍্যাচেল। 'মা ভেবে নিন আমাকে, নিজেকে শিশু। এ-ছাড়া আপাতত চিকিৎসার আর কোন উপায়

নেই।' দক্ষ হাতে ম্যাসাজ শুরু করল ব্যাচেল রানার সারা শরীরে।

একটু পরে রানাকে স্বীকার করতে হলো, কেটে যাচ্ছে ওর হাইপোথারমিয়া।

পৌনে এক ঘণ্টা পর অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ডক্টর র‍্যাচেলের ঘর থেকে বের হলো রানা।

বিজ্ঞানীদের জাগিয়ে সতর্ক করে দিল ও, বাইরে শত্রুতা করছে এমন লোক আছে, কেউ যেন দরজা খুলে না রাখে, ভুলেও যাতে বাইরে না যায়।

সবগুলো দরজা তালা মারা আছে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে এবার নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল রানা দুই মিনিটে।

এখন ও বাইরে ঠাণ্ডায় কাঁপছে, হাতে শিথিল দড়ি, কোথাও যাওয়ার আছে যেন, কিন্তু সেই গন্তব্য সুদূরে—যাওয়া যাবে না, তার আগেই মৃত্যু এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল রানার। উঠে বসতেই কোমরের কাছে ব্যথা লাগল। ঘড়ির লুমিনাস ডায়াল দেখে চমকে উঠল ও, সকাল দশটা বাজে। বিছানা ছাড়ল রানা, পোশাক পরে নিল। কাল রাতের কথা মনে পড়ল। সেই তুলনায় অনেক ভাল বোধ করছে ও এখন।

'এখন কেমন লাগছে?' চমকে গেল রানা দরজার কাছ থেকে প্রশ্নটা শুনে। ঘরে ঢুকেছে র‍্যাচেল, এগিয়ে এলো, রানার পালস চেক করে বলল, 'প্রায় সুস্থ।' চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'একটা কথা, রানা, আপনার জানা দরকার, কর্নেল মাহমুদকে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল থেকে। সবাই আলোচনা করছে সার্চ পার্টি তৈরি করে তাঁকে খুঁজতে বের হবে কি না।'

'কর্নেল তিব্বত মারা গেছেন, মিস র‍্যাচেল,' শান্ত গলায় জানাল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। 'খুন করা হয়েছে তাঁকে।'

বড় করে দম নিল র‍্যাচেল, কিছু বলল না।

'আমাকেও খুন করতে চেয়েছিল।'

'আসলে কী ঘটছে এখানে, কর্নেল রানা?' বিছানার কিনারায় বসল র‍্যাচেল।

সত্যি কথা জানানো দরকার, বুঝতে পারছে রানা। বলল, 'গত রাতে রেডিও কমিউনিকেশনে কোন ঝামেলা হয়েছিল। কর্নেল সেটা কী তা পরখ করতে যান। যখন টাওয়ারের ওপর ওঠেন তখন ভেঙে পড়ে টাওয়ার, তিনি মারা যান। টাওয়ারের গাই ওয়্যার কেটে দেয়া হয়েছিল।'

'কেটে দেয়া হয়েছিল? দুর্ঘটনা নয়?'

'না। তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তারপর টাওয়ারের ওপরে তিনি উঠতেই কেব্‌ল্ কেটে দেয়া হয়েছে।'

'আপনাকে কে গুলি করেছিল?'

'জানি না।' গতরাতে কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল রানা।

গম্ভীর চেহারায় সব শুনল র‍্যাচেল, রানার কথা শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল, 'একটা সিগারেট দেবেন, প্লিজ!'

ধরিয়ে দিল রানা, কাঁপা অনভ্যস্ত হাতে ধরা সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ডক্টর র‍্যাচেল। 'কে খুন করল কর্নেলকে? কেন? কাদের কাজ? আমেরিকানরা?'

'হতে পারে। কালাহান বিজ্ঞানী নয়, সম্ভবত সিআইএ'র এজেন্ট।'

'কর্নেল বা আপনাকে তারা খুন করতে চাইবে কেন?'

'হয়তো শুধু আমাদেরই নয়, সবাইকে খুন করতে চায় ওরা।'

সিগারেটটা আরেকটু হলেই র‍্যাচেলের হাত থেকে পড়ে যেত। 'কেন? আমি তো কোন কারণ দেখছি না!'

'নিজেদের কুকীর্তি গোপন করতে চায়,' বলল রানা। 'কালাহান সম্ভবত তাদেরই লোক। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সবাইকে শেষ করে দিলে সবকিছু ধামাচাপা দেয়া সহজ হবে।'

'আমেরিকানরা তা করবে?' মাথা নাড়ল র‍্যাচেল। 'ইচ্ছে করলে যা খুশি তা-ই করতে পারে তারা সমস্ত দুনিয়াকে কাঁচকলা দেখিয়ে।'

'পারে, কিন্তু তারপরেও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। সে-ঝুঁকি তারা না-ও নিতে চাইতে পারে।' একটু থামল রানা। 'আমি এখনও জানি না কী ঘটেছে আসলে এখানে, তবে জানব।'

'বিশ্রাম নিতে হবে আপনাকে,' রানার চোখে তাকাল র‍্যাচেল। 'যা বললেন সেটা প্যারানয়েড ডিলিউশ্যন বলতে পারতাম, যদি না পরিস্থিতি এমন হতো।...আমার কিছু করার আছে? পারলে সাহায্য করব আমি।'

'কাউকে কিছু বলবেন না,' সিগারেট নিভিয়ে ফেলল রানা। 'সেটাই বিরাট বড় একটা কাজ হবে। মনে রাখবেন, গতকালকের পর আমাকে আর দেখেননি আপনি। রাজি?'

'রাজি,' এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগে বলল র‍্যাচেল।

সাত

দিন অথচ দিনের আলো নেই বললেই চলে। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কিছু। রাতে ঝড় বেড়েছে আরও। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের পুব উইং হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসেছে রানা, মাথায় চিন্তা, বাইরে কর্নেল মাহমুদের হত্যাকারী লোকগুলোর এখন কী অবস্থা।

ঝড় যদি এরকমই থাকে তা হলে তাদের বাঁচবার সম্ভাবনা

খুবই কম। সেক্ষেত্রে সতর্কতা অপেক্ষাকৃত কম হলেও অসুবিধে নেই।

জমাট তুষার সরিয়ে বাড়ির কোনা ঘুরে সামনের দরজার কাছে আসতে বাতাস আ তুষারের বাধা ঠেলে পঞ্চাশ গজ দূরত্ব পেরোতে হয়েছে ওকে, সময় লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

কালাহানকে যদি অপ্রস্তুত অবস্থায় পেতে হয় তা হলে র‍্যাচেলের সাহায্য দরকার হবে। মেয়েটা ভান করতে না পারলে চলবে না। গোয়েন্দা হিসেবে নিজের দক্ষতার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়েছে কালাহান, র‍্যাচেল কাঁচা অভিনয় করলে ধরা পড়ে যাবে।

দরজাটা বরফ জমে শক্ত হয়ে আটকে আছে। কয়েক মিনিট লেগে গেল রানার খুলতে। অ্যান্টার্কটিকা ভেসটিবিউলের ভিতরে ঢুকল ও, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে পরের দরজা খুলল।

ডে রুমে সবাই আছে। কাঁপা হাতে দরজার দিকে একটা ·৪৫ অটোমেটিক ধরে আছেন ডক্টর ব্রিয়াঁ। রানা পার্কার হুড খুলবার পরে চিনতে পেরে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নামালেন অস্ত্রটা। 'গড!' বিড়বিড় করে বললেন।

'ওহ্ রানা! গড্!' রানার দিকে পা বাড়াল রাবিতা, চেহারায় রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

'কোথায় গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হিতৈষী। 'সকালে আপনার খোঁজে পুরো বাড়ি সার্চ করেছি আমরা।'

'রাতটা কাটিয়েছি জেনারেটর বিল্ডিঙে,' র‍্যাচেলের চোখ ছুঁয়ে এলো রানার দৃষ্টি। খেয়াল করল একবারও চোখের পাতা কাঁপল না কালাহানের।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রাবিতা। 'কী হয়েছিল?'

'ডাইনিং হলে যাচ্ছি আমি,' পা বাড়াল রানা। 'জানতে হলে ওখানে চলে এসো। পেটে কিছু দেয়া দরকার।'

একে একে রানাকে অনুসরণ করল সবাই। রাবিতা আর র‍্যাচেলের তৈরি কফি আর স্যান্ডউইচ পেল রানা। দীর্ঘ টেবিলে

বসল সবাই। প্রত্যেকের চোখ রানার উপর। রাবিতা আর ডক্টর হিতৈষীর চেহারা দেখে মনে হলো প্রচণ্ড উদ্বেগে ভুগছেন। গত রাতে কী ঘটেছে তা যদি কালাহান জেনেও থাকে, তার চেহারায় কোন ছাপ নেই।

নাস্তা শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা, ওর বক্তব্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।

'কর্নেল তিব্বত মাহমুদ মারা গেছেন,' শুরু করল রানা।

অন্যান্যদের মতোই বিস্মিত মনে হলো কালাহানকে। সামনে ঝুঁকে বসল লোকটা। 'আমার মনে হয় এখানে কী ঘটছে সেটার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার আপনার, কর্নেল রানা।'

'গতরাতে কর্নেল মাহমুদ রেডিও মেসেজ পাঠাতে চেয়েছিলেন হেডকোয়ার্টারে, কিন্তু টাওয়ারে কোন গোলযোগ দেখা দেয়। চেক করতে যান উনি, যখন ফিরে এলেন না তখন আমি গেলাম কী হয়েছে দেখতে।'

'কীভাবে মারা গেছেন উনি?' জিজ্ঞেস করল রাবিতা, চেহারায় আশঙ্কার ছাপ।

'দুর্ঘটনা,' বলল রানা। 'টাওয়ারে উঠেছিলেন, গাই ওয়্যার ছিঁড়ে যায়। টাওয়ার ধসে পড়ে তাঁকে চাপা দেয়।'

'মেইন গট!' মুখে হাত চাপা দিল র‍্যাচেল। রানাকে স্বীকার করতে হলো, দুর্দান্ত অভিনয় করছে মেয়েটা।

'সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল রাবিতা।

'ঝড় বইছিল। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে আসিনি।'

'দুটো বাড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই গাইড লাইন আছে,' ভ্রূ কুঁচকে বলল কালাহান।

'খুঁজে পাইনি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুষারে চাপা পড়ে গিয়েছিল।'

রাবিতা বলল, 'রেডিওতে বেস ক্যাম্পে খবর পাঠাতে হবে।'

'টাওয়ার ধসে পড়েছে, মিস রাবিতা,' জবাব দিল কালাহান।

'তবে হেলিকপ্টারের রেডিও তো কাজ করার কথা,' বলল রানা। 'ওটার রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে। কিন্তু সাহায্য প্রার্থনা করব না আমি। এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছি আমরা, কাজটা শেষ করতে হবে আগে।'

তর্ক জুড়তে চাইল রাবিতা, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'কর্নেল তিব্বত মারা যাওয়ায় আপাতত আমি আছি এই ইন্সটলেশনের চার্জে। দায়িত্বটা পালন করতে হবে আমাকে। সেজন্যে সবার সহযোগিতা আশা করি আমি।' জার্মান মহিলার দিকে তাকাল ও। 'ডক্টর র‍্যাচেল, অটোপসি থেকে কোন ফলাফল পেয়েছেন?'

'না,' মাথা নাড়ল র‍্যাচেল।

ডক্টর সুং চ্যান মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'গতরাতে বারোটা টিশ্যু স্যাম্পল নিয়ে কালচার করতে দিয়েছি, কয়েক ঘণ্টা পরেই কিছু না কিছু জানা যাবে।'

'তাতে করে বোঝা যাবে কী জিনিস আমাদের লোকদের খুন করেছে?'

প্রথম বারের মতো কালাহানের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখল রানা। মাথা নাড়লেন ডক্টর সুং চ্যান।

'আমি তা বলিনি, কর্নেল। আঁচ করতে পারব বড়জোর। কাজের শুরুও বলতে পারেন।'

'আচ্ছা!' সবার উপরে ঘুরে এলো রানার দৃষ্টি। 'এরমধ্যে কেউ বাইরে যাক তা আমি চাই না। ঝড় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটবে সে-ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

''এবাড়ি ঘুরে দেখা শেষ,' বললেন ডক্টর হিতৈষী। 'এবার ল্যাবোরেটরিগুলোর পালা। তবে আপনি চাইলে, কর্নেল রানা, তুষারের তলা থেকে কপ্টার বের করতেও সাহায্য করতে পারি আমরা।'

'দরকার নেই,' জানাল রানা। 'আমিই পারব। আপনারা বরং ল্যাবোরেটরিতে কাজ করুন।' উঠে দাঁড়াল। 'জানতে হবে কী জিনিস খুন করেছে এতগুলো মানুষকে।'

উঠে পড়ল ডক্টর কালাহানও। 'কী বলতে চান আপনি?'

'এখানে এমন কিছু নিয়ে গবেষণা চলছিল না যে এতোজন মানুষের মৃত্যু হবে।'

'টেস্ট শেষ হওয়ার আগে কিছুই বলা যায় না,' বলল কালাহান। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'তবে একটা কথা ঠিক, এখানে বসে কফি খেয়ে গল্পগুজব করলে কোন কাজই এগোবে না।'

তর্ক করতে উৎসাহী হলো না কেউ। কালাহান বলে চলল, 'মিস্টার রানা, জাতির প্রতি আপনার আনুগত্য আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি, কিন্তু আমরা একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য, যারা চেষ্টা করছি যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। আমি এমন একজন লোক যে নিজের কাজে গাফিলতি করি না।'

কথা শেষ করে বেশ একটা ভারিক্কি ভাব নিয়ে চলে গেল কালাহান। রাবিতা আশরাফ ছাড়া অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। রানার কাপে আবার কফি ঢেলে দিল রাবিতা, তারপর টেবিলের উল্টোদিকে বসল। চেহারায় গাম্ভীর্য। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে আসলে কী ঘটেছে, রানা?'

রাবিতার কাছে গোপন করবার কোন কারণ দেখল না রানা। 'কর্নেল মাহমুদকে খুন করা হয়েছে।'

'কীভাবে?'

কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা। রাতে ওকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে সেটাও বলল। জানাল গাইডলাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

'তা হলে তো রেডিওতে সাহায্য চাওয়া দরকার।'

'চাইব। তার আগে নিজের জন্যে একটা অস্ত্র যোগাড় করে

নাও। বাইরে যারা আছে তারা যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের ওপর হামলা করতে পারে।'

'আর কে জানে এ-ব্যাপারটা?'

'ডক্টর র‍্যাচেল।'

'আমেরিকানদের কাজ, তাই মনে করো তুমি, রানা? কালাহান এসেছে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' হাত বাড়িয়ে রাবিতাকে উঠতে সাহায্য করল রানা। 'তবে নিজেকে শক্ত রাখো। ও যদি টের পায় তুমি কিছু জানো তা হলে খুন করতে দ্বিধা করবে না।'

'কী করব আমি বুঝতে...' কথা শেষ করল না রাবিতা।

'অপেক্ষা করো।' কর্নেল তিব্বতের সঙ্গে ভাইরাস নিয়ে কী আলাপ হয়েছে খুলে বলল রানা। জানাল সম্ভবত সাবমেরিনে করে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

'কালাহানকে গ্রেফতার করলে হয় না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আসলে কী ঘটেছে সেটা তা হলে জানা যাবে না। তা ছাড়া, তার লোকজন বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছে। ওরা সশস্ত্র।'

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাবিতা। 'আমার ভয় করছে, রানা।'

ওর হাতে আলতো করে চাপ দিল রানা। 'কালাহানের সামনে যেয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রাবিতা চলে যাওয়ার পরে ডে রুম হয়ে বাড়ির পশ্চিম দিকে চলে এলো রানা, সাপ্লাই রুম থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করল। একটা কোদাল, একটা শাবল আর এক কয়েল দড়ি। ওগুলো নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে ওয়ালথারে নতুন ম্যাগাজিন ভরল, তারপর পার্কার পকেটে অস্ত্রটা রেখে বেরিয়ে এলো ঝড়ের ভিতর।

বাতাস এতো জোরে বইছে যে দাঁড়ানো অসম্ভব, ক্রল করে

এগোতে হবে। দরজার হ্যান্ডেলে দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে আরেক প্রান্ত কোমরে পেঁচিয়ে নিল রানা, কয়েলে কোথাও ছেঁড়া নেই দেখে নিয়ে ক্রল করে তুষারে ছাওয়া কপ্টারটা লক্ষ্য করে এগোল এবার।

মনে হলো অনন্তকাল লাগছে ওর বাতাসের বিরুদ্ধে এগোতে, তারপর দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছল রানা।

তুষারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। একবার থামল আওয়াজ শুনবার জন্য। মনে হলো যেন স্নোক্যাটের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে। আর শোনা গেল না। মনে হলো বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনেনি।

হাড়ে কামড় বসাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। কোমরের কাছে রক্তের ভেজা একটা অনুভূতি বলে দিচ্ছে ক্ষতটার মুখ খুলে গেছে আবার। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা সম্ভব হবে না। বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি বেশি দেরি করে তা হলে শীতে জমে গিয়ে মৃত্যু হবে।

চলে এসেছে ওর কপ্টারের কাছে। এবার আসল কাজ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটানা পরিশ্রমে ঘামতে শুরু করল ও। কপ্টারের একটা পাশ তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে আছে। খুঁড়তে হলো। পাশের কার্গো ডোরের ল্যাচ খুলে ঢুকে পড়ল মেশিনের ভিতরে। বাতাসের অত্যাচার থেকে বাঁচা গেল। এবার কোমর থেকে রশি খুলে পাইলটের সিটে গিয়ে বসল ও।

তীব্র শীতে ফুসফুস ব্যথা করছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে বুকের খাঁচায়। ক্ষতটা টিসটিস করছে ব্যথায়। অনেকক্ষণ লাগল শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে। কন্ট্রোল প্যানেলে মনোযোগ দিল রানা, মেইন সুইচ অন করতেই ব্যাটারি ইন্ডিকেটর অর্ধেকের বেশি চার্জ দেখাল। রেডিও অন করল ও, কপ্টারের ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে ভরে উঠল কমিউনিকেশন রিসিভারের খড়ড়-মড়ড় শব্দে। মাইক্রোফোনটা তুলে নিল ও, টক সুইচ অন করে মুখের কাছে তুলল। ঠিক তখনই কপ্টারের ফুয়েলের গন্ধটা নাকে এলো ওর।

কন্ট্রোল প্যানেলের আলো ছাড়া কপ্টারের ভিতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। মাইক নামিয়ে পকেট থেকে পেনলাইট বের করে জ্বালল ও, আলোটা তাক করল কার্গো রাখবার জায়গাটার দিকে।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর ডেকের ভেজা জায়গাটায় আলো পড়ল। উপর থেকে কী যেন পড়ছে ডেকে। পাইলটের সিট ছেড়ে কার্গো বে'তে চলে এলো রানা, ওখানে গ্যাসোলিনের গন্ধ অনেক বেশি তীব্র।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। কী যেন গোলমাল হয়ে গেছে কপ্টারের। উপর থেকে সূক্ষ্ম একটা রিনরিনে গুঞ্জনের মতো আওয়াজ আসছে। কপ্টারের ফুয়েল পাম্পটা অন করা। লিক করেছে ওটা, কার্গো বে'র ভিতরে হাই-অকটেন ছিটিয়ে দিচ্ছে। বোধহয় ফুয়েল পাম্প সুইচের পাশের মেইন সুইচটা শর্ট সার্কিট হয়েছে, সিস্টেমও লিক হয়ে গেছে ওটার সঙ্গে।

এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে একটা।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে ফিরে তাকাল রানা। যাইরোগুলো চলছে। বাতি জ্বলছে। এখন শুধু ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ, ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ দরকার এভিয়েশন গ্যাস ভরা কপ্টারটা বিস্ফোরিত হতে।

শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। ওর আগেই কেউ এসেছিল কপ্টারের কাছে!

পকেটে টর্চটা রেখে দিল রানা, রশিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো কপ্টার থেকে। উঁচু বরফ পার হয়ে দেহ গড়িয়ে দিল ও তুষারের মধ্যে। ঝড়ের দাপটের ভিতরে সরে এলো যতো দ্রুত সম্ভব।

আর বেশিক্ষণ নেই গ্যাস ফিউম জমে বিস্ফোরণ ঘটতে। একটা চিন্তাই এখন ঘুরছে রানার মাথায়, সরে যেতে হবে। রশি ধরে ক্রল করে সরতে শুরু করে দিল ও।

বিশ গজও সরতে পারল না ও, তার আগেই প্রচণ্ড একটা

ধাক্কা খেয়ে দশ ফুট দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল ভারী নিচু ভোঁতা গর্জন। গরম বাতাস ওকে ঝাপটা দিয়ে গেল। এই মাত্র গলে যাওয়া তুষার আবার জমে গিয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল বৃষ্টির মতো।

কার্গো বে'তে রানার পার্কায় অকটেন লেগেছে, ফাঁৎ করে জ্বলে উঠেছে ওটার একটা অংশ। তুষারে গড়াগড়ি খেয়ে আগুনটা নিভাল ও। কপ্টারের টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ওর চারপাশে। সামান্য পোড়া পার্কাটার কথা বাদ দিলে রানাকে প্রায় অক্ষতই বলতে হয়।

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল রানা। বাতাসের আস্কারা পেয়ে বেড়ে ওঠা আগুনের কুণ্ডলী ইতিমধ্যেই মরে যেতে শুরু করেছে।

ওটার দিকে তাকাল রানা। সময় মতো গ্যাসোলিনের গন্ধ না পেলে মরতে হতো। চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানা। এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ঝড়ের ভিতরে কারও জানবার কথা নয় বিস্ফোরণে ও বেঁচে গেছে কি না। ইন্সটলেশনের কোথাও যদি ও লুকিয়ে থাকে তা হলে কালাহান এবং তার লোকেরা ধরে নেবে ও মারা গেছে। কিন্তু যদি ফিরে যায় তা হলে কালাহান ধরেই নেবে কেউ কমিশনের ব্যর্থতা চাইছে সেটা ও জানে।

দুটোতেই সুবিধে-অসুবিধে আছে।

ও না ফিরলে কালাহান নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করবে, তাতে তার ভুল করবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে বাধা দেওয়ার কেউ নেই মনে করে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে সে। প্রয়োজনে অন্যান্যদের খুন করতেও তখন বাধবে না তার।

আর রানা যদি ফেরে তা হলে সতর্ক হয়ে উঠবে সে, কারও বিপক্ষে কিছু করবে না...রানা মরবার আগে পর্যন্ত।

হাতড়ে হাতড়ে রশিটা খুঁজে বের করতে হলো ওকে। থামল এক মুহূর্ত। আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। বিপজ্জনক, কিন্তু

তাতে বিপদ থেকে অন্যদের সরিয়ে রাখা যাবে। তখন হয়তো বাধ্য হয়ে কালাহানের লোকদের সিদ্ধান্তসূচক একটা কিছু করতে হবে।

ব্যাপারটা দাবার মতো। একটা ভাল চালের বিপরীতে কয়েকটা চাল দেওয়া যেতে পারে। শত্রু কী করতে যাচ্ছে সেটা বুঝবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজে চাল দেওয়া এবং প্রতিপক্ষের চালের জন্য অপেক্ষা করা।

পিছনের আগুনটা পুরোপুরি নিভে গেছে। রশি ধরে ধরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সদর দরজায় পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগল ওর। দরজা খুলে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল রানা. ওয়ালথার বের করবার জন্য হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে পকেটে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে রানাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল কালাহান। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। গম্ভীর স্বরে বলল, 'বিস্ফোরণটা আমি দেখেছি। কী ঘটেছিল?'

রাবিতা আর র‍্যাচেল ছাড়া অন্যরা পৌঁছে গেছে। সবারই একই জিজ্ঞাসা।

'কী হলো? আপনি আহত হননি তো?'

সবার উপরে ঘুরে এলো রানার দৃষ্টি। কালাহান হয় অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা, নয়তো কপ্টারের ফাঁদের ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

'কপ্টারের ফুয়েল সিস্টেমে লিক ছিল,' বলল রানা। 'আমি ওটা থেকে বের হতেই বিস্ফোরিত হয়েছে।'

'মেসেজ পাঠাতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল কালাহান।

সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল রানা। 'না। তবে সাহায্যের জন্যে যাব ঠিক করেছি।'

'কীভাবে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল কালাহানের।

'স্নো-ট্র্যাক আছে নিশ্চয়ই ইন্সটলেশনে। একটা নিয়ে মালয়েশিয়ান বেসে চলে যাব।'

'এই আবহাওয়ায় অসম্ভব,' ভ্রূ কুঁচকে গেল কালাহানের।

'না,' দ্বিমত পোষণ করলেন ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ। 'সম্ভব। একটা হোমিং ডিভাইস লাগবে, যাতে বেসের সাড়া পাওয়া যায়।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' বলল রানা।

দক্ষিণের করিডরের কাছে একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা। আবার চেঁচাল। নারীকণ্ঠ। ডে রুমে ছিটকে এসে ঢুকল রাবিতা। মুখটা একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাসে।

'রানা!' তীক্ষ্ণ স্বরে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল। 'ডক্টর র‍্যাচেল! ডক্টর র‍্যাচেল! মারা গেছেন!'

'কী বললেন?' চরকির মতো ঘুরলেন ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ।

ডক্টর হিতৈষী আস্তে করে রাবিতার মাথায় হাত বুলিয়ে নীরব সান্ত্বনা দিলেন। রানা চলে এসেছে রাবিতার সামনে।

'কী বললে, রাবিতা?'

'মারা গেছেন! ডক্টর র‍্যাচেল মারা গেছেন! সেফসুট পরেননি। মরে গেছেন!'

'কোথায়?'

'ল্যাবে।'

'চলো,' পা বাড়াল রানা।

'না,' একই সঙ্গে বাধা দিলেন ব্রিয়াঁ আর ডক্টর হিতৈষী। 'একটু আগেই আমরা এ-ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। ডক্টর র‍্যাচেল একমত হননি। এখন আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি মৃতদেহগুলোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

সুং চ্যান জানালেন, 'আমার কালচার পজিটিভ হয়েছে। এখানে যারা মারা গেছে তারা প্রত্যেকেই বাতাস থেকে একটা এজেন্ট গ্রহণ করেছে। তার চেয়েও বড় কথা, সেটা টিশ্যুর ভেতরে অদৃশ্য অবস্থায় রয়ে যাবে বহুদিন।'

'ব্যাখ্যা করুন।'

'প্রত্যেকটা লাশ জীবিতদের জন্যে মৃত্যু বহন করছে। যে-এজেন্ট তাদের মেরেছে সেটা কাজ করছে এখনও।'

কালাহানকে দেখে মনে হলো মুখটা চুনকাম করা।

সুং চ্যান বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে ল্যাবে আসতে পারেন, কিন্তু আমাদের বায়োলজিকাল সেফ সুট পরতে হবে।'

রাবিতার দিকে তাকাল রানা। 'তুমি ভিতরের কিছু ছুঁয়েছ? সেফ সুট পরনে ছিল তোমার।'

'হ্যাঁ।' ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। 'না। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। দেখলাম...অন্যদের মতো...মরে পড়ে আছেন!'

'আপনারা কেউ ডে রুম ছেড়ে যাবেন না,' নির্দেশ দিল রানা।

পাঁচ মিনিট লাগল ডক্টর সুং চ্যান আর রানার বায়ো সুট পরে নিতে। হেলমেট সীল করে বাতাস চালু করে দিল ওরা, তারপর এগোল পশ্চিমের করিডর ধরে। ওখানেই সাপ্লাই রুমে ল্যাব চালু করা হয়েছে।

ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপরে রাখা আছে একটা পুরুষ দেহ। ওটার পাশে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে র‍্যাচেল। চোখ দুটো খোলা, মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভ, অর্ধেক হয়ে গেছে দাঁতের কামড়ে। থুতনিতে জমে আছে রক্ত। পরিষ্কার বোঝা যায়, মৃত্যুর আগে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।

হাঁটু মুড়ে বসে চট করে পরীক্ষা করলেন সুং চ্যান, উঠে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ দেখতে পেল রানা হেলমেটের ভিতর দিয়েও।

'মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে,' সুটের রেডিওতে ধাতব কণ্ঠে বললেন চ্যান। 'মাংসপেশীগুলোও ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে।'

'অন্যদের মতো একই কারণে মৃত্যু?'

দেহ দুটো শেষবারের মতো দেখে দরজার দিকে পা বাড়ালেন ডক্টর। 'হ্যাঁ। জীবাণুগুলো এখনও সক্রিয়!'

আট

কালাহানের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আলোচনায় ঠিক হলো রানা যাচ্ছে মেইন বেসে। বিজ্ঞানীরা যখন মেইন্টেন্যান্স গ্যারাজ থেকে বের হলেন, ততোক্ষণে প্রায় সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। দুপুরের বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে ওঁদের দীর্ঘ, কঠিন যাত্রার জন্য স্নো-ট্র্যাক প্রস্তুত করতে। রেডিও রুমের কিছু ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে কাজ চালাবার মতো একটা দিক নির্দেশক তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

'আপনি পুরোপুরি সোজা দিকনির্দেশনা পাবেন না,' সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ব্রিয়াঁ। 'তবে বেসের যতো কাছে যাবেন ততো নিখুঁত রিডিং পাবেন।'

মেশিনের ট্যাঙ্ক ভরে তেল নেওয়া হয়েছে। ইমার্জেন্সি রেশনও বাদ যায়নি। আর আছে একটা আর্কটিক শেলটার টেন্ট আর ক্যাটালিটিক হিটার।

বাইরে ঝড়ের প্রকোপ না কমে বরং বেড়েছে আরও, শোঁ-শোঁ আওয়াজ করে বয়ে চলেছে। গ্যারাজের ভিতর দিয়ে রানার দিকে আসতে আসতে সার্ভিস ডোরের দিকে তাকাল কালাহান একবার, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

'মনে হচ্ছে বাইরে যাওয়া উচিত হবে না,' বলল রানা।

সায় দিল কালাহান। 'বুঝতে পারছি না আপনি বেসে ফেরার জন্যে এতো তাড়াহুড়ো করছেন কেন। ঝড় থামলেও তো যেতে

পারেন।'

'আগেও আমরা এ-ব্যাপারে কথা বলেছি,' বলল রানা। 'এখানে সব ঠিক আছে সেটা আমি বেস ক্যাম্পকে জানাতে চাই। সবাই, এমনকী আপনাদের সরকারও নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় ভুগছে। ঝড়টা থামলেই কপ্টার আর রেডিও গিয়ার নিয়ে ফিরব।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রানার চোখে তাকিয়ে থাকল কালাহান, বোধহয় রানা কতোটা সত্যি বলছে সেটা যাচাই করতে চাইল। কৌতূহল বোধ করছে রানা কতোটুকু জানে অথবা আন্দাজ করেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, কর্নেল রানা।'

ডক্টর হিতৈষী স্নো-ট্র্যাকের পিছনের কার্গো শেলফে হাতের মানচিত্র বিছালেন, আঙুল দিয়ে চারটে বড়-বড় জায়গা দেখিয়ে দিলেন। মালয়েশিয়ান বেস আর এই ইন্সটলেশনের মাঝখানের এইসব জায়গায় গভীর খাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

'মেশিনে একটা ক্রিভ্যাস ডিটেক্টর আছে,' জানালেন ব্রিয়াঁ। 'সোনারের মতো কাজ করে, তবে আসলে একশো ভাগ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না।' ম্যাপ থেকে রানার দিকে মুখ তুললেন তিনি। 'এই এলাকাগুলোয় খুব আস্তে যেতে হবে আপনাকে। ডিটেক্টরকে বারকয়েক ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ দিতে হবে।'

'আমি এখনও বলছি বোকামি করছেন, কর্নেল রানা,' বলল কালাহান।

কয়েক সেকেন্ড গভীর মনোযোগে ম্যাপটা দেখল রানা। প্রথম খাদের অঞ্চলটা ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের দিকে যাওয়ার সরাসরি পথের উপরে পড়ে, ইন্সটলেশন থেকে মাইল দশেক দূরে ওটা। রানা ধারণা করল, ওই পথের মাঝখানে কোথাও ক্যাম্প করে অপেক্ষায় আছে কালাহানের লোকজন। ক্রিভ্যাসের এই অঞ্চলটা যদি ঝামেলা ছাড়া পার হয়ে যাওয়া যায়, তা হলে বাকি পথে গোলমালে পড়বার সম্ভাবনা অনেক কম।

ম্যাপটা ভাঁজ করে স্নো-ট্র্যাকের ভিতরে রেখে দিল ও। হ্যান্ডশেক করল সবার সঙ্গে 'আপনাদের সাহায্যের জন্যে সত্যিই ধন্যবাদ।'

ও-কিছু-না ধরনের হাসি দিল কালাহান, বলল, 'প্রার্থনা করছি ঠিক-ঠিক ফিরে আসুন।'

'তা আমি আসব,' গম্ভীর শোনাল রানার গলা। 'তবে একটা কথা, আমি যতোক্ষণ থাকছি না, সবার ওপরে একটু লক্ষ রাখবেন আপনি। আমরা কেউ চাই না আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটুক।'

'চিন্তা করবেন না।' কালাহানের পার্কার পকেট থেকে এক বোতল ব্র্যান্ডি বের হলো। 'এই আবহাওয়ায় অন্তত দশ ঘণ্টা লাগবে সাউন্ডে যেতে। বিশ্রামের ফাঁকে হয়তো মনে হবে দু-এক ঢোক খাওয়ার কথা।'

বোতলটা নিল রানা। মুখের সীল ঠিক আছে দেখে ওর মনে হলো না মদে কিছু মেশানো হয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন: মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত লোককে শেষ বারের মতো খাতির করে পানি দিয়ে বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকা।

'ধন্যবাদ।' বোতলটা সামনের সিটের পিছন-পকেটে রেখে দিল রানা, কন্ট্রোলের পিছনে উঠে বসল।

'গুডবাই, কর্নেল রানা,' হাত নাড়ল কালাহান।

'আবার দেখা হবে,' জবাব দিল রানা, দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিন চালু করল।

পার্কার হুড তুলে দিল কালাহান, খুলে দিল গ্যারাজের দরজা।

স্নো-ট্র্যাকে গিয়ার দিতেই হেলেদুলে সামনে বাড়ল ওটা, বরফের ঢাল বেয়ে উঠে বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। হেডলাইটের আলোয় তুষার আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দশ-বারো ফুটের বেশি দেখা গেল না।

মেইন বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে গিয়ে জেনারেটর বিল্ডিং আর পড়ে থাকা রেডিও টাওয়ার পার হলো রানা, ইন্সটলেশন পিছনে ফেলে

এগোল ঝড়ের ভিতর দিয়ে। আধমাইল পেরিয়ে আসবার পর স্নো-ট্র্যাক থামাল ও, ম্যাকমার্ডো সাউন্ড, মালয়েশিয়ান বেস আর ওয়েদার সার্ভিস রেডিও স্টেশনের দিকে ডিরেকশন ফাইন্ডার ঘুরাল। প্রবল তুষার ঝড়ের কারণেই হয়তো, রিসেপশন অত্যন্ত দুর্বল। মাঝে মাঝে বিরতিও পড়ছে। তবে এটুকুই আরডিএফ বেয়ারিং নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কোলের উপরে ম্যাপ বিছিয়ে সাউন্ডের কাছে মালয়েশিয়ান হেডকোয়ার্টারের বেয়ারিং নিল রানা। বামদিকে আরেকটা ইন্সটলেশন আছে। প্রাইভেট, যেটা একাধারে ওয়েদার এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টার। এখনও পঞ্চাশ মাইল দূরে ওটা।

যদি আরডিএফ ট্র্যাকের সামান্য ডানদিক ঘেঁষে এগিয়ে যায় তা হলে এই দূরত্ব থেকে বেয়ারিঙের পার্থক্য বড়জোর এক বা দু'ডিগ্রির, তার মানে প্রাইভেট ইন্সটলেশনে পৌঁছে ওখান থেকে মালয়েশিয়ান হেডকোয়ার্টারে রেডিও করতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

ম্যাপ এক পাশে সরিয়ে রেখে ডোম লাইট নিভিয়ে দিল রানা, আবার রওনা হলো ঝড়ের মাঝ দিয়ে। ক্রিভ্যাস স্ক্যানার সামনে বরফের মধ্যে কোন খাদ আছে কি না সেটা যাচাই করে দেখছে। হেডলাইটের আলোটা কোন কাজেই আসছে না ওকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া। হুঙ্কার দিয়ে বয়ে যাওয়া দমকা বাতাসের মধ্যে ইঞ্জিনের গুঞ্জনটাই সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

ড্রাইভ করতে করতে র‍্যাচেল বনেটের কথা মনে এলো রানার। বেচারি এই দুর্ঘটনার তিরিশতম শিকার। কর্নেল তিব্বত মাহমুদ অন্তত জানতেন কিসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, নিজেকে রক্ষা করবার সামর্থ্যও ছিল তাঁর। বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছিলেন তিনি। এমন একটা ভুল, যেটার মাসুল গুনতে হয়েছে জীবন দিয়ে।

অসমতল বরফ আর তুষারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টায় পনেরো

থেকে বিশ মাইল বেগে স্নো-ট্র্যাক ছোটাচ্ছে রানা। আধঘণ্টা পর থামল আবার।

সামনে মানচিত্রে দেখানো সেই ক্রিভ্যাসের অঞ্চল। এখন থেকে পরবর্তী কয়েক মাইল সাবধানে বুঝেশুনে এগোতে হবে।

ম্যাকমার্ডো ওয়েদার সিগনাল এখনও খুব দুর্বল ভাবে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় বেয়ারিং বলছে ঠিক পথেই আছে ও। ম্যাপটা আবার দেখল। প্রধান খাদগুলো পথের ডানদিকে পড়বে। সহজে ওগুলোকে এড়াতে হলে পুবদিকে কয়েক মাইল সরে তারপর উত্তর-পুবে এগোতে হবে আবার।

থেমে থাকায় মৃদু গুঞ্জন করছে স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিন। ম্যাপ সরিয়ে রেখে ক্লাচ করে গিয়ার দিতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময়ে উইন্ডশিল্ডে একটা আকৃতি দেখতে পেল।

একজন লোক। শীতের সাদা পোশাক পরা। হাতে একটা কালাশনিকভ রাইফেল, নলটা ওর বুকেই তাক করা!

আস্তে করে স্টিয়ারিং কলাম থেকে হাতদুটো সরিয়ে মাথার উপরে তুলল রানা।

উইন্ডশিল্ডের সামনে দাঁড়ানো লোকটা মাথা দুলিয়ে ইশারা করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রানার দিকে দরজাটা খুলতে শুরু করল। চট করে বামদিকে কাত হয়ে গেল রানা, গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছেড়ে দিল। লাফিয়ে সামনে বাড়ল স্নো-ট্র্যাক। কালাশনিকভের গুলিতে ফুটো হয়ে গেল উইন্ডশিল্ড। ধাক্কা খেয়ে পাশে পড়ে গেল লোকটা, চলে গেল বামদিকের ট্র্যাকের নীচে। প্যাচ-প্যাচ একটা অসুস্থকর আওয়াজ পেল রানা লোকটার চেপটে যাওয়ার।

বামদিকের ট্র্যাকটা লক করে দিল রানা, এখন স্নো-ট্র্যাক একই জায়গায় ঘুরতে থাকবে। এবার দ্রুত হাতে ওয়ালথারটা বের করে নিয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের দিকে সরল। পুরোটা সময় উইন্ডশিল্ডের আড়াল নিচ্ছে। দরজা খুলেই ঝড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল ও তুষারে।

বামদিক থেকে ছয়-সাতটা গুলি হলো স্নো-ট্র্যাক লক্ষ্য করে। গড়ান দিয়ে ততোক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসেছে রানা, মাযল্-ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে পাল্টা চারটে গুলি করল ও।

ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে কাতরে উঠল এক লোক। ডাইভ দিয়ে স্নো-ট্র্যাকের আড়ালে চলে গেল রানা। এক মুহূর্ত পরে ও ঠিক যেখানে ছিল সেখানে নাক গুঁজল কয়েকটা বুলেট।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে ধীরগতি স্নো-ট্র্যাকের সঙ্গে চলেছে রানা, আড়ালটা ব্যবহার করছে পুরোপুরি। দু'মিনিট পার হয়ে গেল স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিন আর ঝড়ো বাতাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপর আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

স্নো-ট্র্যাকের ছাদে পিছলে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আরও কুঁজো হলো রানা, কান পেতে আছে অন্য শব্দটা শুনবার জন্য। শুনতে পেল আবার। আরেকটা স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিন, কিছুটা দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে মেশিনটা। বেশি দূরে হবে না, নইলে বাতাসের হাহাকার ছাপিয়ে আওয়াজটা ওর কানে আসত না।

শেষ গুলিটা করা হয়েছে বেশ দূর, ডানদিক থেকে। সেদিকে পরপর দুটো গুলি করল রানা, তারপর ওর মেশিনের সামনে দিয়ে ঘুরে ওপাশে চলে গেল। তুষারে প্রায় শুয়ে পড়েছে ও।

ওর স্নো-ট্র্যাক ঝড়ের ভিতর দৃষ্টিসীমার আড়ালে সরে গেল। কয়েকটা গুলি করা হলো ওটাকে লক্ষ্য করে। গুলিগুলো ডানদিক থেকে আসছে।

এবার থেমে থাকা মেশিনটার আওয়াজ ঠিক পিছনে শুনতে পেল রানা। ঘুরে বসল ও, ক্রল করে এগিয়ে চলল আওয়াজটা লক্ষ্য করে। বিশ ফুট পেরোতেই দেখতে পেল ওটাকে। বড় একটা স্নো-ট্র্যাক। হেডলাইট বন্ধ ওটার, কিন্তু ইঞ্জিন চলছে।

পিছনের জানালার কাছে গিয়ে সাবধানে ভিতরে উঁকি দিল ও। স্টিয়ারিং কলামের পিছনে বসে আছে গরম জামা পরা এক তরুণ। মাইক তুলে নিয়ে কী যেন নির্দেশ দিল, শুনতে পেল না

রানা।

রেডিওর স্পিকারে জবাবটা অবশ্য স্পষ্ট শুনল।

'মেশিনের আড়ালে আছে মাসুদ রানা।'

ওর নাম জানল কী করে লোকগুলো? কাল্যহান?

'ধ্বংস করে দাও ওটাকে,' আরেকটা লোক খেঁকিয়ে উঠল। 'তবে সাবধান! শালা যাতে না মরে!'

মাথা নিচু করে জানালার কাছ থেকে সরে প্যাসেঞ্জার সাইডে চলে এলো রানা, দরজায় কান পাতল।

'তাড়াতাড়ি করো!' আগের কণ্ঠটা রেডিওতে ধমক দিল।

'ওটার পেছনে যাচ্ছি আমরা,' জবাব এলো।

এক ঝটকায় দরজা খুলে ওয়ালথারটা ড্রাইভারের মাথায় তাক করল রানা। দূরত্ব ছয় ইঞ্চির বেশি নয়।

'মাইক্রোফোনে একটা কথা বলো, লাশ ফেলে দেব তোমার,' নিচু গলায় হুমকি দিল ও।

চোখের কোণে রানা আর ওর অস্ত্রটা দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল চমকিত তরুণের। ডান হাতে ধরে রেখেছে সে মাইক্রোফোন। ভাব দেখে মনে হলো টক সুইচে টিপ দিয়ে দেবে।

রানা খেয়াল করল, ড্রাইভারের পোশাক বেসামরিক, প্রাইভেট কোম্পানির লোগো বুকে। কে কে। 'ঠিক মগজে গাঁথবে বুলেট,' শান্ত গলায় জানাল রানা। 'খামোকা মরাটা কি ঠিক হবে?'

'ওর মেশিনটা চক্কর মারছে,' রেডিওতে জানানো হলো।

'ওটার পেছনে যাও, আরেক পাশে,' অন্য একটা গলা নির্দেশ দিল স্পীকারে।

'মাইক্রোফোন নামাও,' ওয়ালথারে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা।

আস্তে করে প্যানেলে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল তরুণ ড্রাইভার। সাবধানে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে এলো রানা, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'কী চান?' ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল তরুণ।

'বাইরে ক'জন আছে?'

'তিন,' সামান্য দ্বিধার পর বলল তরুণ।

'ক্যাম্পে ক'জন?'

'কেউ নেই।'

'মিথ্যে বলছ,' কঠোর হয়ে গেল রানার চেহারা। 'কালাহানকে খুন করার আগে সে জানিয়েছে ক্যাম্পে অন্তত দশজন আছো তোমরা।'

'আমি তো এইমাত্র মিস্টার কালা...' ভুলটা বুঝতে পেরে থেমে গেল ড্রাইভার। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ওর।

ভয়ঙ্কর শীতল মাপা হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। ওয়ালথারটা ড্রাইভারের মাথায় ঠেসে ধরল। 'মিথ্যে বললে খুন হয়ে যাবে, ব্রাদার। ক্যাম্পে ক'জন আছে?'

'আরেকটা টিম। চারজনের। একজন গুরুতর আহত।'

'ক্যাম্প কোথায়?'

'আসার সময় পেরিয়ে এসেছেন।'

'ডিগবার্টকে পেয়েছি,' রেডিও সক্রিয় হয়ে উঠল। ড্রাইভার মাইক্রোফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

'ভ্লাদিমির, ডিগবার্ট মারা গেছে।'

ঝড়ের ভিতর পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। আধ মিনিট পর স্পীকারে জানানো হলো, 'ওর মেশিনটা থামানো গেছে।'

'শয়তানের বাচ্চা,' আরেকটা লোক ক্ষোভ প্রকাশ করল। 'ধরে নিয়ে যেতে বসের নির্দেশ না থাকলে শালাকে ফেলে চলে যেতাম। বরফে জমে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরত। এমনিতেই মরবে, খামোকা জ্বালাচ্ছে।'

'চলো, রওনা হই আমরা,' বলল রানা।

চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকাল ড্রাইভার। 'কোথায়?'

'ম্যাকমার্ডো সাউন্ডের কাছে। মালয়েশিয়ান মেইন ক্যাম্পে।'

'কিন্তু...ওদের এখানে ফেলে রেখে...মারা যাবে তো ওরা!'

'মরবে না,' ওয়ালথারটা নাচাল রানা। 'রওনা দাও। ইমার্জেন্সি রেশন, টেন্ট আর হিটার আছে আমার মেশিনে।'

একমুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল তরুণ, রানাকে ওয়ালথারের ইজেক্টর স্লাইড টান দিয়ে পিছনে নিতে দেখে দ্বিধা কেটে গেল। তার মনে হলো বদ্ধ জায়গায় ধাতব আওয়াজটা কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে। তাগাদা দিল রানা, 'রওনা দাও, নইলে বাধ্য হয়ে তোমাকে শেষ করতে হবে।'

আস্তে করে গিয়ার দিল তরুণ, ঝড়ের ভিতরে হেলেদুলে এগোল স্নো-ট্র্যাক।

'টিমথি?' ড্রাইভারের নাম ধরে ডাকল একটা কণ্ঠ।

'জোরে চালাও,' তাগাদা দিল রানা।

'ভ্লাদিমির...টিমথি!...ও দেখছি চলে যাচ্ছে!'

'টিমথি?' চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'টিমথি!'

রেডিওর সুইচটা বন্ধ করে দিল রানা, এক হাতে পার্কার পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। 'সোজা মালয়েশিয়ার বেস। কিন্তু ক্রিভ্যাসের ব্যাপারে সাবধান। দুর্ঘটনায় তুমি মারা যাও সেটা আমি চাই না।'

'আমার রেডিও ডিরেকশন ফাইন্ডার আমাদের বেসের জন্যে টিউন করা আছে। ক্রিসটাল কন্ট্রোল্ড। মালয়েশিয়ার বেসের দিকে যেতে পারব না। পথ হারিয়ে ফেলব। রেডিও ডিরেকশন ফাইন্ডার রিটিউন করা সম্ভব নয়।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' নির্বিকার চেহারায় জানাল রানা। 'আমি তোমাদের ওয়েদার ক্যাম্পেই যাব।'

চট করে রানাকে দেখল ড্রাইভার। হাসল রানা। 'ওখানে গিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।' এক টানে মাইক্রোফোন আর

কর্ড ছিঁড়ে নিল ও কমিউনিকেশন রেডিও থেকে, জানালা খুলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এখন যা-ই ঘটুক, ক্যাম্পে বা কালাহানের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় রইল না। এখন শুধু দু'জন আছে ওরা এই বিরান অঞ্চলে। উপকূলের আগে পর্যন্ত তা-ই থাকবে। ক্রিভ্যাসের কারণে ঘুরপথে যেতে হবে বলে গন্তব্য এখনও একশো পঁচিশ মাইল দূর।

কিছুক্ষণ পর ক্রিভ্যাস ডিটেক্টর নড়ে উঠল। স্নো-ট্র্যাক একশো গজ বামে সরিয়ে নিয়ে গেল তরুণ ড্রাইভার, তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ডানে, আগের যাত্রাপথে ফিরে এলো মিনিট দুয়েক পর।

একই কাজ বার ছয়েক করতে হলো, তারপর ক্রিভ্যাসের বিপজ্জনক অঞ্চলটা পিছনে ফেলে এলো ওরা। রানা বুঝল, ড্রাইভারকে ভাল মতো শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে কীভাবে এলাকাটা পার হতে হবে।

'তোমাদের লোক আমাদের ইন্সটলেশনের কাছে কী করছিল?' নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রানা। কী যেন একটা ওর মনে পড়তে পড়তেও পড়ছে না।

রানার দিকে তাকাল তরুণ, কিন্তু কোন জবাব দিল না। খুব বেশি বয়স হবে না তার। দুঃখই বোধ করল রানা তার জন্য। বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেছে বেচারা। একদিকে আনুগত্য অন্যদিকে গুলি ভরা তৈরি ওয়ালথার পিপিকে।

প্রয়োজনে পিস্তলটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না রানা। অনেক মানুষ মারা গেছে অকারণে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ুক তা ও চায় না। সম্ভবত সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওই প্রাইভেট ইন্সটলেশনে। মনটা কেমন খচখচ করছে ওর। ড্রাইভারের ইউনিফর্মের লোগোটা তার কারণ।

'টিমথি,' আবার বলল রানা। 'আমার ধৈর্য কিন্তু খুব কম। হয় তোমাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, নয় তো মরতে হবে। প্রয়োজনে

আমি একাই মেশিনটা চালিয়ে তোমাদের ক্যাম্পে যেতে পারব।'

রানার দিকে তাকাল ড্রাইভার, চোখে স্পষ্ট ভয়। 'কী জানতে চান, বলুন।'

'কী করছে তোমাদের লোকরা আমাদের ইন্সটলেশনের ওখানে?'

'আমাদের পাঠানো হয়েছিল যাতে আপনাদের কেউ ইন্সটলেশন থেকে বের হতে না পারেন বা বেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন।'

'কেন?'

'জানি না।'

'না জানলে তো চলবে না, টিমথি।'

'সত্যি বলছি, জানি না।'

'কতোক্ষণ তোমাদের ওখানে থাকতে বলা হয়েছিল?'

'যতোক্ষণ না পরবর্তী নির্দেশ দেয়া হয় সরে আসার।'

'নির্দেশটা কার দেয়ার কথা? কীভাবে?'

'মিস্টার কালাহানের। রেডিওতে তাঁর জানানোর কথা।'

'কালাহানের বস্ কে, আমেরিকানরা?'

চুপ করে থাকল তরুণ।

'জবাব দিচ্ছ না যে?'

'মিস্টার চৌধুরী।'

কে কে! চট করে রানার মাথায় লোগোটার কথা খেলে গেল। কবীর চৌধুরী আর তার ছেলের কোম্পানি না তো!

'কবীর চৌধুরী?'

'জী।'

'এখানে কী করছে সে? ওয়েদার নিয়ে গবেষণা চলছে না ওখানে এটা তো ঠিক। কী করছে? কীসের রিসার্চ চলছে আসলে ওখানে?'

'আমি জানি না, সার।'

ড্রাইভার সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হলো রানার, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে।

কালাহান তা হলে ডাবল এজেন্টের কাজ করছে। বিক্রি হয়ে গেছে লোকটা কবীর চৌধুরীর কাছে। আমেরিকানরা কি ব্যাপারটা জানে? মনে হয় না। এখানে নিরাপদ আস্তানা গেড়ে বসে গভীর কোন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে পাগল বৈজ্ঞানিক, বাংলাদেশী আর মালয়েশিয়ান বিজ্ঞানীদের কিডন্যাপ করেছে নিজের কোন বদ মতলব হাসিল করতে। কর্নেল তিব্বত মাহমুদের কথা মনে এলো রানার। কালাহান দেখেছিল কর্নেলকে রেডিও অ্যান্টেনার সমস্যা ঠিক করবার জন্য বাইরে যেতে। নিশ্চয়ই তার লোকজনই সমস্যাটা তৈরি করেছিল। তারপর কর্নেল টাওয়ারে উঠবার পর অধীনস্থদের নির্দেশ দেয় সে পথের কাঁটা দূর করতে। কুকীর্তিটা করতে কোন ঝুঁকিই নিতে হয়নি লোকটাকে।

'রেডিও টাওয়ারের কেবলগুলো কে কেটেছিল?'

তরুণের চোখের ভয় দেখে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমিই কেটেছ?'

ঘনঘন মাথা নাড়ল ড্রাইভার। হাত কাঁপছে মৃদু মৃদু। 'না। কে করেছে...আমি জানি না। আমাকে ড্রাইভিঙের কাজে পাঠানো হয়েছে।'

'ইন্সটলেশনের বাকিদের কী হবে? কালাহান কি তাদেরও খুন করার নির্দেশ দেবে?'

'না। বলা আছে পালাবার চেষ্টা না করলে তাদের কিছু করা হবে না।'

'আর কেউ যদি বের হবার চেষ্টা করে? ধরো...আমার মতো?'

চুপ করে থাকল ড্রাইভার। আর কোন প্রশ্ন করল না রানা। জবাবটা কী হতে পারে বুঝতে পারছে স্পষ্ট।

রাত দুটোর দিকে ঝড়ের দাপট একটু যেন কমল। ম্যাকমার্ডো

সাউন্ডের পাশে কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশন এখনও অন্তত এক ঘণ্টার পথ। রেডিও ডিটেক্টর নিয়মিত জোরাল আওয়াজ করছে। ক্রিভ্যাসের শেষ এলাকাটাও পিছনে পড়ে গেছে।

মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। এখন ও যা করতে যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু না করেও উপায় নেই। কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে সেটা জানতে হলে বাঘের গুহায় ঢুকবার ঝুঁকিটা নিতেই হবে। খুব ভোরে ইন্সটলেশনে পৌঁছবে ওরা। রাতের প্রহরীরা তখন সবচেয়ে কম সতর্ক থাকবে। তা ছাড়া ওরা ওখানে যাচ্ছে তা সম্ভবত কেউ আশা করছে না। কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশন কোন আর্মির বেস নয়, কাজেই প্রহরাও কিছুটা শিথিল থাকবার কথা।

'গেটে গার্ড আছে?' নীরবতা ভাঙল রানা।

হঠাৎ রানার গলা শুনে চমকে গেল তরুণ।

'গার্ড। গার্ড আছে?'

'না।'

'এমন কোন জায়গা আছে যেখানে যেতে হলে অনুমতি নিতে হয়, বা প্রহরী থাকে?'

'ল্যাবোরেটরি।'

'কমিউনিকেশন সেন্টার? ওখানে প্রহরা নেই?'

'না। তবে বিশেষ দরজাগুলো...বন্ধ থাকে।'

'একটা কথা, টিমথি। বিশ্বাস কোরো, নইলে ঠকবে। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

অনিশ্চিত ভাবে মাথা দোলাল ড্রাইভার।

'তুমি আমাকে কমিউনিকেশন সেন্টারে নিয়ে যাবে। সকালে যে দায়িত্বে থাকবে তার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

'আপনি কিছুতেই ওখানে ঢুকতে...'

'পারব।' নিশ্চিত শোনাল রানার গলা। বিজ্ঞানীরা সম্ভবত এখনও কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশনে বন্দি হয়ে আছে। তাদের

উদ্ধার করতে হবে। 'পারতে হবে আমাকে। তোমার জানা জরুরি যে ওখানে ঢুকে কোন কিছু নষ্ট করব না আমি। কাউকে আঘাতও করব না পারতপক্ষে। কিছু তথ্য দরকার আমার। সেগুলো পেলেই আমি খুশি।'

'আমি আপনাকে সেন্টারে নিয়ে যেতে পারব না। বিনা অনুমতিতে ওখানে আমার যাবার এক্তিয়ার নেই। আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি তা হলে বস্ আমাকে খুন করবেন। বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করেন না উনি।'

'না। সে খুন করবে না তোমাকে। তোমার পিঠে পিস্তল ধরে ভেতরে নিয়ে যাব আমি। সাহায্য করতে যখন তুমি বাধ্য, তাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে না। যদি না শোনো, তা হলে আমার হাতেই মরতে হবে তোমাকে। সেটা খুবই দুঃখজনক হবে।'

চুপ করে গম্ভীর চেহারায় ড্রাইভ করছে তরুণ। রানা বলল, 'এবার আরও কিছু কথা। কয়েকজন বিজ্ঞানীকে ওখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তুমি জানো? আমার চোখের দিকে তাকাও।'

এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল তরুণ।

'তুমি জানো।' আধ-খালি ক্লিপটা বের করে নিয়ে পিস্তলে শেষ ক্লিপটা ভরল রানা। 'কোথায় রাখা হয়েছে তাদের?'

ঢোক গিলল ড্রাইভার। 'হ্যাঙ্গারের পাশের কোয়ার্টারে।'

সিটে হেলান দিল রানা। 'পাহারা আছে?'

'আমি জানি না। হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁদের।'

'ভেতরে ঢুকবার উপায় কী?'

'আমি জানি না, সার, বিশ্বাস করুন।'

প্রহরী থাকলে তাদের খুন করতে হবে। থাকবেই এটা নিশ্চিত। বিজ্ঞানীদের উদ্ধার জরুরি একটা কাজ। মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে তাঁদের।

তুষার এখনও ঘন হয়ে পড়ছে। দু'ফুট দূরেও কিছু দেখা যায়

না। ঝড় কমছে। আর কয়েক ঘণ্টা পর হয়তো একেবারে থেমে যাবে। তার আগেই সমস্ত কাজ সেরে বের হয়ে আসতে হবে।

ক্যাম্প পাঁচ মাইল দূরে থাকতেই তুষারে গাঁথা প্লাস্টিকের রডে একটা পতাকা দেখতে পেল ওরা। ওখানে বামদিকে মোড় নিল তরুণ, গতি বাড়াল স্নো-ট্র্যাকের। একশো গজ পার হতেই দ্বিতীয় একটা মার্কার চোখে পড়ল। তৃতীয়টা আরও একশো গজ দূরে।

আরডিএফ-এর সুইচ বন্ধ করে দিল টিমথি। 'এখন পতাকাই আমাদের পথ দেখাবে।'

'চালাকি কোরো না,' সাবধান করল রানা। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না।'

দশ মিনিট পরে বামদিকে তীব্র একটা আলো চোখে পড়ল ওর। 'ওটা কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রানওয়ে। বাতিটা টাওয়ারের।'

কয়েক মিনিট পর ডানদিকে পড়ল একটা দীর্ঘ নিচু বিল্ডিং। ওটাকে পাশ কাটিয়ে ইন্সটলেশনের আঙিনায় ঢুকে পড়ল স্নো-ট্র্যাক। স্টিয়ারিঙে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে টিমথির হাত। মুঠোগুলো ফুলে উঠেছে। রক্ত সরে গেছে আঙুল থেকে।

'কোন চালাকি নয়, টিমথি।'

রানার দিকে তাকাল তরুণ।

গভীর রাত এখন। দেখে মনে হচ্ছে ইন্সটলেশনে কেউ নেই। মাথায় অজস্র অ্যান্টেনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লম্বাটে বিল্ডিঙের সামনে স্নো-ট্র্যাক থামাল টিমথি।

নিজের দিকের দরজার হাতলে হাত রাখল রানা। 'ডিউটি অফিসার কোথায় থাকবে, টিমথি?'

'দরজায়।'

'চলো। ইঞ্জিন চালু থাক।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামল তরুণ। তার পিঠে ওয়ালথার ঠেসে ধরে

বাড়িটার ভিতরে ঢুকল রানা, কোন প্রহরীর দেখা পেল না। একটা করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে টিমথি। শেষ মাথায় স্টিলের একটা দরজা। বাইরের দিকে হাতল নেই, শুধু কলিং-বেল সুইচ আর একটা পিপ হোল।

টিমথির কানের কাছে বলল রানা, 'মিস্টার কালাহানের কাছ থেকে একটা মেসেজ নিয়ে এসেছ তুমি। খুব জরুরি। এক্ষুণি খবরটা কর্তৃপক্ষকে জানানো দরকার, জানাও।'

বাযারে টিপ দিল টিমথি। তার পিঠে ওয়ালথার দিয়ে মৃদু খোঁচা দিল রানা। 'সাবধান, টিমথি।'

একমুহূর্ত পরে দরজার ওপাশে হাজির হলো কেউ। 'কী ব্যাপার?' ছাদের স্পীকার থেকে মোটা একটা ধাতব স্বর ভেসে এলো।

'একটা মেসেজ আছে। মিস্টার হাইমেকে দিতে হবে।'

'সকালে। সার ঘুমাচ্ছেন।'

ওয়ালথার আরও একটু জোরে ঠেসে ধরল রানা টিমথির পিঠে।

'তা হলে সেকেন্ড ইন কমান্ডকে জানাব। সকালে আমাকে চলে যেতে হবে। মেসেজটা মিস্টার কালাহানের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে।' গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল ধাতব দরজা।

পরক্ষণে ঢলে পড়ল টিমথি মাথার পিছনে ওয়ালথারের বাঁটের মাপা ওজনের বাড়ি খেয়ে। অন্তত দু'ঘণ্টা অজ্ঞান থাকবে সে। তৈরি হয়ে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলছে।

নয়

স্বাভাবিক উচ্চতার একজন লোকের বুক যেখানে থাকবার কথা সেই বরাবর অস্ত্র তাক করেছিল রানা, ভাবতেও পারেনি হাঁটু সমান লম্বা কেউ খুলতে পারে দরজাটা। ওয়ালথার হাতে অপরিচিত রানাকে আর অজ্ঞান টিমোথিকে দেখেই ষাঁড়ের মতো মোটা গলায় বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল বামন, 'ওরেহ্!' তারপর ঘুরেই দিল দৌড়, অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে খাটো-খাটো পায়ে ছুটে গিয়ে একটা টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ল একটুও কুঁজো না হয়ে।

অতোটুকু শরীর থেকে অমন ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বিস্মিত রানা। চট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, পিছনে বন্ধ করে দিল স্টিলের দরজাটা। লক হয়ে গেল দরজা। গলার রগ ফুলে উঠল ওর চিৎকার করতে গিয়ে। 'খবরদার! অ্যালার্ম বাজাবে না কেউ! খুন হয়ে যাবে!' ওয়ালথার ঝাঁকি দিয়ে বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করল।

বিরাট একটা ঘর। বামনকে বাদ দিলে লোক আছে মোটে চারজন। ফাঁকা মনে হচ্ছে ঘরটাকে। সারি সারি টেলিটাইপ মেশিন, কম্পিউটার আর রেডিও ইকুইপমেন্ট বসানো হয়েছে একপাশের দেয়াল জুড়ে।

ঘরের আরেক প্রান্তে বসা এক রেডিও অপারেটর মুখের সামনে মাইক্রোফোন তুলতে যাচ্ছিল, তার সামনে রাখা রেডিও গিয়ারে একটা গুলি সেঁধিয়ে যন্ত্রটা অকেজো করে দিল রানা।

'মাইক্রোফোন নামাও!'

কুঁই-কুঁই একটা আওয়াজ শুনতে পেল ও টেবিলের নীচ থেকে। বামন কাতর কান্নাজড়িত স্বরে এক নাগাড়ে প্রার্থনা করে চলেছে।

চট করে ডেস্কে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল অপারেটর।

'সরে এসো,' নির্দেশ দিল রানা। 'ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াও।'

মাথার উপরে হাত তুলে নির্দেশ পালন করল লোকটা।

'তোমরাও সরে এসো,' অন্যদের উদ্দেশে বলল রানা। 'জলদি!'

বাকি তিনজনও নির্দেশ পালন করল। বামন এখনও টেবিলের তলায়।

'চার্জে কে আছো?'

একজনও জবাব দিল না।

বছর চল্লিশেক বয়সের গম্ভীর চেহারার এক লোককে এদের বস্ মনে হলো রানার, তার দিকে ওয়ালথার তাক করল রানা। 'আপনি?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল লোকটা।

'তা হলে আপনাকেই আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। ঠিক ঠিক জবাব যদি পাই তা হলে কারও কোন ক্ষতি না করেই চলে যাব আমি। নাম কী আপনার?'

'পাবলো সাইমন।'

'মিথ্যে বললে মারা পড়বেন, পাবলো।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

বাইরে একটা সাইরেন বাজতে শুরু করেছে, শুনতে পেল রানা। বোধহয় ইঞ্জিন চালু খালি স্লো-ট্র্যাকটা সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। পাবলো সাইমনের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল।

'হাসির কিছু নেই,' সামনে বাড়ল রানা। 'প্রয়োজনে খুন

করতে বাধবে না আমার।'

হাসিটা ঠোঁটে জমে গেল লোকটার, শুষ্ক গলায় বলল, 'জীবন নিয়ে এখান থেকে বের হতে পারবেন না আপনি।'

'সেটা আমার চিন্তা।' লোকগুলোর দশ ফুট দূরে থামল রানা, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল, 'এখন আমার প্রশ্নের জবাব দিন। উপকূলের কোথাও একটা সাবমেরিন আসার কথা। সেটা এসেছে কি না আমি জানতে চাই। যদি না এসে থাকে তা হলে কখন এবং কোথায় আসবে সেটা বলুন।'

করিডরে কেউ এসে হাজির হয়েছে। বাযার বাজল। কেউ সাড়া না দেওয়ায় স্টিলের দরজায় দমাদম ঘুসির আওয়াজ হলো।

'বলে ফেলুন, আমার ধৈর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে।' আওয়াজটার দিকে মনোযোগ না দেওয়ার চেষ্টা করছে রানা।

আবার বাযার বেজে উঠল। দরজায় আরও জোরাল ধাক্কা পড়ছে এখন।

দু'হাতে ওয়ালথারটা তুলে পাবলো সাইমনের মাথায় লক্ষ্যস্থির করল রানা, ট্রিগারে ধীরে ধীরে চেপে বসছে আঙুল। লোকটার পিছনে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে কবীর চৌধুরীর হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

'না!' বিপদ বুঝতে পেরে সাহস হারিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লোকটা। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা...আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে সাবমারসিবলটা আসবে।'

'কোথায়?'

'সাউন্ডের শেষ মাথায়। মাউন্ট স্যাবিনের নীচে।'

'এখান থেকে বের হওয়ার আর কোন পথ আছে?'

'না।'

'আপনাদের বস্ কোথায়? কবীর চৌধুরী?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল লোকটা। 'বাইরে আছেন উনি।'

'সাবমারসিবলে আসবে?'

জবাব দিল না লোকটা, তার চোখই রানাকে জবাবটা জানিয়ে দিল।

দরজা পিটানো এখন রীতিমতো জোরেশোরে চলছে। আওয়াজ শুনে মনে হলো ব্যাটারিং র‍্যাম ব্যবহার করছে কয়েকজন মিলে। স্টিলের দরজা, কিন্তু কতোক্ষণ টিকবে বলা মুশকিল।

ঘরের চারপাশটা দেখল রানা। সিলিং-এর কাছে দেয়ালে একটা ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা বড় শ্যাফটে গিয়ে ঢুকেছে অনেকগুলো তার।

'সবাই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন,' নির্দেশ দিল রানা।

দ্বিধায় ভুগছে লোকগুলো, ভয় পাচ্ছে রানা একে একে গুলি করে মারবে তাদের।

'কী বলছি!' ধমক দিল রানা।

এবার তড়িঘড়ি পালিত হলো নির্দেশ।

'পা ছড়িয়ে শুতে হবে। মাথার পেছনে হাত।' একটা চেয়ার টেনে শ্যাফটের কাছে নিয়ে গেছে রানা, ওটার উপর উঠে দাঁড়াল। শ্যাফটের ঢাকনি হিসাবে যে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছে সেটায় কব্জা আছে, টান দিতেই নীচের দিকে নামল। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হলো নামবার সময়।

এখন থেমে থেমে ব্যাটারিং র‍্যামের ধাক্কা পড়ছে দরজায়। থরথর করে কাঁপছে স্টিলের দরজা, যে-কোন সময় ভেঙে পড়বে

মেঝেতে শোয়া এক লোক মাথা তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে পিস্তল তাক করল রানা। আবার মাথা নিচু করে নিল রেডিওম্যান। ভয়ে শরীর আড়ষ্ট করে পড়ে থাকল।

পার্কার পকেটে পিস্তলটা রেখে দিল রানা, দু'হাতের জোরে উঠে পড়ল শ্যাফটের কিনারা ধরে, ঢুকে পড়ল ভিতরে। যথেষ্ট চওড়া শ্যাফট, কিন্তু উঁচু নয়। কেব্‌ল্‌গুলো জড়াজড়ি করে দু'দিকে

চলে গেছে। মাথায় ছাদের ঠোক্কর খেতে খেতে ক্রল করে সামনে এগোল রানা।

দরজা পিটানো চলছে, সেই সঙ্গে বাজছে সাইরেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয় কাটিয়ে উঠে দরজাটা খুলে দেবে ঘরের ভিতরের লোকগুলো, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ধাওয়া। মেইন শ্যাফটের শেষ মাথায় একটা ভেন্টিলেশন শ্যাফটের কাছে পৌঁছে গেল রানা, জোরে টান দিতেই খুলে গেল ঢাকনিটা। বিল্ডিঙের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ও, লাফ দিয়ে নামল বারো ফুট নীচের বরফে। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা; তারপরই আরেকটা বিল্ডিং। আকার আকৃতিতে কমিউনিকেশনস স্টেশনের মতোই। একটা জানালাতেও আলো জ্বলছে না। বোধহয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং। রাত বলেই হয়তো কেউ নেই।

চট করে শুয়ে পড়ল রানা তুষারের উপরে। গা মিশিয়ে দিয়েছে বিল্ডিঙের দেয়ালের সঙ্গে।

পাশের একটা সরু রাস্তা ধরে সগর্জনে ধেয়ে গেল দুটো স্নো-ট্র্যাক। তুষারপাতের ভিতরে ওগুলোর হেডলাইটের আলো দেখে মনে হলো দানবের হলদে ঘোলা চোখ। ওগুলো চলে যাওয়ার পর দ্রুত পায়ে কমিউনিকেশনস সেন্টারের কোনায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ও। ছুটাছুটি করছে অনেকে ব্যস্ত হয়ে। অন্তত সাতটা স্নো-ট্র্যাক এদিক ওদিক টহল দিচ্ছে। আরও আছে পনেরো-বিশজন লোক। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

রেডিও রুমের দরজাটা খুলতে আর বেশি দেরি হওয়ার কথা নয়। বামনই বোধহয় আগে ভয় কাটিয়ে উঠে খুলে দেবে। তার মানে ও কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেটা আবিষ্কার করতে সময় লাগবে না। সার্চ আরও জোরাল হবে তখন। বিজ্ঞানীদের উদ্ধার করে মালয়েশিয়ান বেস-এ পৌঁছতে হলে যা করবার করতে হবে দ্রুত।

কমিউনিকেশনস বিল্ডিঙের আরেকদিকের কোনায় গিয়ে

আবার উঁকি দিল রানা। এদিকে স্নো-ট্র্যাক আর সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা ওদিকের চেয়েও বেশি। এতো বেশি লোকের চোখ এড়িয়ে সরে যাওয়া অসম্ভব।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের কাছে ফিরে এলো রানা, স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিনের গর্জনে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ কারও কানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, ওয়ালথারের বাঁটের বাড়িতে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল ও। ভাঙা কাঁচ সরিয়ে অন্ধকার অফিস ঘরে ঢুকে বেরোবার দরজায় কান পাতল। কোন আওয়াজ নেই ওপাশে। নবে মোচড় মারতেই খুলে গেল দরজা।

পরের ঘরটা অপেক্ষাকৃত বড়। বেশ কয়েকটা ডেস্ক আর ডজন খানেক ফাইল কেবিনেট আছে। পা টিপে টিপে অন্ধকার ঘরের দরজায় পৌঁছে আবার কান পাতল রানা। এবারও কোন আওয়াজ নেই ওদিকে। দরজাটা খুলতেই সামনে দেখতে পেল অন্ধকার একটা করিডর। পুরো বিল্ডিংটাকে দু'ভাগ করেছে করিডরটা। করিডর ধরে বাড়ির সামনের দিকে পা বাড়াল ও নিঃশব্দে। করিডরের শেষ মাথায় একধারে ডে রুম। ওটার জানালা ভেদ করে আসছে বাইরের কর্মব্যস্ততার আওয়াজ। ঢুকে পড়ল ও ভিতরে। ডিম লাইট জ্বলা ঘরটা পার হতে গিয়ে খেয়াল করল জানালার সামনে এক লোকের আবছা আকৃতি ওর দিকে পিঠ দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু আরেকবার ভাল করে চারপাশ দেখে নিল রানা। ডানদিকে এক প্রস্থ সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। বামদিকে একটা বুলেটিন বোর্ড আর অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বিরাট একটা ওয়াল ম্যাপ।

লোকটার ঠিক পিছনে গিয়ে ওয়ালথারের নলটা তার পিঠে ঠেসে ধরল ও। 'সাবধান! নাম কী তোমার?'

চমকে ঘুরতে যাচ্ছিল লোকটা, পিস্তলের নল পিঠে ঠেকেছে টের পেয়ে থেমে গেল।

'চিৎকার করো, গুলি খেয়ে মরবে।' নল দিয়ে খোঁচা দিল রানা।

'কে!' অস্ফুট কাঁপা স্বরে জানতে চাইল লোকটা।

'আমি,' জবাব দিল রানা। 'যাকে তোমরা পাগল হয়ে খুঁজছ। ওরা যদি আমাকে খুঁজে পায় তা হলে আমার আগে মরবে তুমি।'

'কী চান?' গলায় জোর আনবার চেষ্টা করল লোকটা।

'এখান থেকে বের হতে চাই। তোমার স্নো-ট্র্যাক আছে?'

একে বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হলো রানার, কোন ধানাইপানাই না করে জবাব দিল, 'পেছনে।'

'পার্কা কই তোমার?'

'ওখানে।' একটা চেয়ার দেখাল লোকটা। ওটার পিঠে একটা পার্কা ঝুলানো আছে।

'তা হলে ওটা পরে নাও, আমরা এখন বেড়াতে বের হবো। যা বলছি করবে তুমি, নইলে আজকে কী ঘটেছে সেটা কাউকে জানাবার সুযোগ পাবে না আর কোনদিন।'

'আচ্ছা।' পার্কার দিকে পা বাড়াল সে রানার আগে আগে। 'আমি বাবুর্চি। গুলি করবেন না। আমার কাছে অস্ত্র নেই। কীভাবে চালাতে হয় তা-ও জানি না।'

তাগাদা দিল রানা। 'স্নো-ট্র্যাকের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

পার্কা পরে নিয়ে সুবোধ বালকের মতো সামনে সামনে চলল বাবুর্চি করিডর ধরে। বাড়িটার শেষ মাথায় পৌঁছে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?'

'মালয়েশিয়ান বেসে।'

'সে-তো একশো মাইলের বেশি দূরে!'

'হ্যাঁ। তো?'

ঘাড় ফিরাল বাবুর্চি। 'আমার মেশিনটা ছোট। এটা দিয়ে অতো দূরে যাওয়া যাবে না। অতো তেল ভরার মতো বড় ট্যাঙ্কই নেই

এটার।'

'বড় স্নো-ট্র্যাক কোথায় পাওয়া যাবে?'

'সবখানে,' খুকখুক করে কাশল বাবুর্চি।

'এমন একটার কাছে আমাকে নিয়ে চলো যেটার কাছে কেউ নেই।'

'সারাই করবার কারখানায় যেতে হবে তা হলে। ওখানে এখন কারও থাকার কথা নয়।'

'তা হলে ওখানেই যাচ্ছি আমরা।' দরজার দিকে ইশারা করল রানা। 'বেরোও।'

বাড়ির পিছনে এক ধারে ছোট্ট একটা স্নো-মোবাইল রাখা আছে। ওটার সামনে থামল বাবুর্চি। তাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে নিজেও পাশের সিটে বসল রানা, এক বারের জন্যও লোকটার উপর থেকে পিস্তল সরাল না।

'নাম কী তোমার?'

'রবার্ট হ্যারিসন।...আপনার?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। তো, রবার্ট, আমি তোমাকে খুন করতে চাই না। এমন কিছু কোরো না যাতে কাজটা করতে আমি বাধ্য হই। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

'জী না।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বাড়ির কোনা ঘুরল বাবুর্চি, রাস্তায় পড়ে ধীর গতিতে এগোল। হৈ-হট্টগোলের নীচে চাপা পড়ে গেছে ওটার ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

কমিউনিকেশনস সেন্টারের চারপাশের হুড়োহুড়ি আর ব্যস্ততা শীঘ্রি পিছনে পড়ে গেল। চওড়া একটা রাস্তায় পড়ল স্নো-মোবাইল। একটু পরেই দেখা গেল রানওয়ে আর মেইনটেন্যান্স বিল্ডিং। একটা বাড়ির ছাদে উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বলছে রানওয়ে চিহ্নিত করবার জন্য। ওই বাতিটা ছাড়া ধারেকাছে আর কোন বাতি নেই। একজন লোকও দেখা গেল না এয়ারফিল্ডের

এদিকে।

'হ্যাঙ্গারের কাছে যাও,' নির্দেশ দিল রানা।

বাঁক নিল স্নো-মোবাইল, কোনাকুনি ভাবে বাতিটার দিকে এগিয়ে চলল। রানওয়েতে কয়েকটা কপ্টার আর ছোট প্লেন দেখল রানা, প্লাস্টিকের কাভার দিয়ে ঢাকা। বিরাট একটা বাড়ির সামনে স্নো-মোবাইল থামাল বাবুর্চি, রানার দিকে তাকাল। চোখে স্পষ্ট ভয়। তার কাজ শেষ, এবার আশঙ্কা আরও জোরদার হয়েছে যে রানা তাকে খুন করবে। কাঁপা গলায় বলল, 'এখানেই স্নো-ট্র্যাক মেরামত করা হয়, সার। আপনার ব্যবহারের জন্যে একটা না একটা পেয়েই যাবেন।...আমি এবার যাই?'

'যাবে, অতো তাড়া কিসের!'

'আমাকে মারবেন না, সার!'

'তার কোনও দরকার দেখছি না, কথা শুনলে মরবে না।' লোকটার প্যান্টের বেল্ট খুলতে বাধ্য করল রানা, ওটা দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে বেরিয়ে পড়ল দরজা খুলে, ওই অবস্থাতেই বাবুর্চিকেও বের হতে বাধ্য করল।

'সার, বিশ্বাস করুন আমি জানি না ওখানে মেশিন আছে কি না। আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি জানলে বস্ আমাকে মেরে ফেলবে।'

'মরবে না।' ওয়ালথার নাচাল রানা। 'এগোও।'

নির্জন বাড়িটার ভিতরে ঢুকল ওরা দু'জন প্রশস্ত দরজা দিয়ে। বাবুর্চির ঠিক পিছনেই আছে রানা। ভিতরটা অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে দরজার পাশের সুইচ বোর্ড খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বালল রানা।

স্নো-ট্র্যাকেরই গ্যারাজ এটা। এগারোটা স্নো-ট্র্যাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একটাও আস্ত নয়। প্রত্যেকটা মেশিনের ইঞ্জিন কাউলিং খোলা, কয়েকটার ট্র্যাক নেই, দুটোর ইঞ্জিন দেখা গেল না। ওগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানান যন্ত্রাংশ।

মেশিনগুলো ভাল মতো দেখে রানার দিকে অসহায় চোখে তাকাল বাবুর্চি, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, চোখ বিস্ফারিত। বাতির সুইচ অফ্ করে দিল রানা, লোকটাকে পিছন থেকে ঠেলা দিল। 'বেরোও, এখানে কাজ হবে না।'

দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগে বাইরে উঁকি দিল ও। সুযোগটা নিল ভীত বাবুর্চি, ঝেড়ে দৌড় দিল অন্ধকার ঘরের ভিতরে, কোন একটা মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

লোকটাকে ধাওয়া করবার চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা, সময় নেই। হাত বাঁধা অবস্থায় যতোক্ষণ ইচ্ছে লুকিয়ে থাকুক লোকটা, কাউকে সতর্ক করতে পারবে না সহজে। সার্চ পার্টি তাদের সার্চের আওতা বাড়াবে কমিউনিকেশনস বিল্ডিং থেকে ও বের হতে পেরেছে জানবার সঙ্গে সঙ্গে।

বেরিয়ে এলো ও বাইরের বরফ-শীতল আবহাওয়ায়, বাবুর্চির মোবাইলে উঠে এগোল হ্যাঙ্গারের দিকে।

গ্যারাজের পাশেই হ্যাঙ্গার, তারপর খানিকটা দূরে একটা চৌকো বিল্ডিং। বাংলাদেশী দুজন এবং মালয়েশিয়ান একজন বিজ্ঞানীকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে।

একটা দুশো পাওয়ারের বাতির আলো জ্বলছে বাড়িটার সামনে। স্নো-মোবাইল সদর দরজার সামনে থামতেই এগিয়ে এলো তিনজন গার্ড। হেডলাইট অফ করে দিল রানা।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরজা খুলল না ও, তারপর প্রথম গার্ড বরফ জমে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরজার কাঁচে উঁকি দিতেই গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলল ও দরজাটা। বাড়ি খেয়ে বেসামাল হয়ে গেল লোকটা। ঝট করে বেরিয়ে এলো রানা, ওয়ালথার তুলল বাকি দুই গার্ডকে লক্ষ্য করে।

কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে শুরু করেছে দু'জনেই।

দু'বার রানার হাতে ঝাঁকি খেল ওয়ালথার পিপিকে। বাতাসের কারণে পিস্তলের টাশ্‌টাশ্‌ আওয়াজ দুটো ফাঁপা শোনাল। মাথায়

গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল দুই গার্ড। তৃতীয়জন দরজার ধাক্কা সামলে নিয়ে দেখল তার দুই সঙ্গী পড়ে আছে তুষারের উপর, তাদের মাথার ক্ষত থেকে তুষারে লাল রক্ত ছড়াচ্ছে, জমে যাচ্ছে পরমুহূর্তে। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে গিয়ে ভুল করল না সে, ধীরে ধীরে মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াল।

হাতের ইশারায় লোকটাকে বিল্ডিঙের দিকে যেতে নির্দেশ দিল রানা। নির্দেশ পালিত হলো, গার্ডের কাঁধের স্ট্র্যাপে এখনও রাইফেল ঝুলছে।

'চাবি?' দরজার পেটমোটা তালাটা দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার কাছে নেই,' স্প্যানিশ উচ্চারণে ইংরেজিতে জানাল গার্ড। 'বস্ সেকেন্ড ইন কমান্ডকে চাবি দিয়েছেন, আর কারও ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই।'

তালার মাঝ বরাবর একটা গুলি করল রানা। থেঁতলে গেল তালা। খুলেও গেল। দরজা ঠেলে খুলল ও।

'ঢোকো ভেতরে,' নির্দেশ দিল রানা। দূরে হলদে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে সার্চের পরিধি বাড়াতে শুরু করেছে কবীর চৌধুরীর লোকজন। কমিউনিকেশনস রুমের দরজা খুলে ফেলা হয়েছে।

গার্ডকে সামনে রেখে ভিতরে ঢুকল রানা। দুটো পঁচিশ পাওয়ারের বাতির আলোয় ভিতরটা স্বল্পালোকিত। বিরাট একটা ঘর, শেষ প্রান্তে দুটো লোহার খাঁচা, তাতে কম্বলের উপরে বসে আছেন হাতে-পায়ে শেকল আটকানো বন্দি বিজ্ঞানীরা।

ওয়ালথারটা তাক করে রেখে অন্য হাতটা বাড়াল রানা গার্ডের দিকে। 'রাইফেলটা দাও। সাবধানে। আমার যাতে মনে না হয় তুমি ওটা ব্যবহার করতে চাও।'

দু'হাতে নল ধরে বেকায়দা ভঙ্গিতে রাইফেলটা কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে রানার হাতে দিল গার্ড, বদলে উপহার হিসেবে রানার

কাছ থেকে পেল মাথার তালুতে ওয়ালথারের বাঁটের মাপা একটা বাড়ি। অচেতন লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল রানা, আস্তে করে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

দুটো গুলি খরচ করতে হলো ওকে সেল দুটোর তালা গুঁড়িয়ে দিতে। বিজ্ঞানীরা উঠে দাঁড়িয়েছেন, চোখ বড় বড় করে রানার কাণ্ড দেখছেন।

নিজের পরিচয় দিল রানা। 'আমি আপনাদের উদ্ধার করতে এসেছি। জলদি যে-যার পার্কা পরে নিন।'

'এ অসম্ভব!' বলে উঠলেন মালয়েশিয়ান বন্দি। 'আপনি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন।'

একদম সময় নেই হাতে, বাংলায় গড়গড় করে নিজের পরিচয় দিল রানা, বাংলাদেশী দুই বিজ্ঞানীকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলল। নিজেদের ভিতর আধ মিনিট দ্রুত কথা বললেন তাঁরা। চেহারা দেখে মনে হলো এবার মালয়েশিয়ান বিজ্ঞানীও বিশ্বাস করেছেন রানার বক্তব্য, তাড়াহুড়ো করে পার্কা পরে নিচ্ছেন তিনিও।

'চলুন!' তাগাদা দিল রানা।

এগোলেন বিজ্ঞানীরা ওর পিছনে।

পায়ে শেকল পরা হলেও দেখা গেল শেকল দু'ফুট লম্বা, ধীর পায়ে হাঁটতে পারবেন বিজ্ঞানীরা। আপাতত শেকল ছিঁড়বার ঝামেলায় গেল না রানা, তিনজনের শেকলের পিছনে সময় নষ্ট করবার উপায় নেই এখন।

তাগাদা দিয়ে তিনজনকে বের করে আনল ও বন্দিশালা থেকে, মনটা খানিক দমে গেল দূরের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে। এদিকেই এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকটা স্নো-ট্র্যাকের ঘোলাটে হলদে হেডলাইট।

'জলদি!' আবার তাড়া দিল ও বিজ্ঞানীদের। 'হ্যাঙ্গারে যেতে হবে আমাদের। ওখানে নিশ্চয়ই কপ্টার পাওয়া যাবে।'

যতোটা দ্রুত সম্ভব শেকল পরা অবস্থায় হাঁটছেন বিজ্ঞানীরা। গুলি করে প্রত্যেকের শেকল খুলবার সাহস হলো না রানার। যতোটা সম্ভব নিঃশব্দে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। একা ওর পক্ষে এতোজন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়।

হ্যাঙ্গারের ভিতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সেই আলোয় তিনটে 'কপ্টার দেখতে পেল রানা। তিনটেই রাশিয়ার তৈরি। একটা হিন্দ ওয়ারক্র্যাফট। ওটা বাদ। যুদ্ধযানটা চালানোর অভিজ্ঞতা নেই ওর। বাকি দুটোও অপরিচিত। একটার যন্ত্রপাতি খুলে রাখা হয়েছে, তবে অন্যটা আস্ত বলেই মনে হলো। চেষ্টা করলে হয়তো পারবে ও ফ্লাই করতে। ইগনিশন কী-ও ঝুলছে সকেটে!

আওয়াজ করতে নিষেধ করে আস্ত কপ্টারটায় বিজ্ঞানীদের উঠিয়ে দিল রানা। মাস্টার সুইচ অন করল ও মেশিনটার। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের যাইরো ইকুইপমেন্ট জীবন পেয়ে আলোকিত হয়ে উঠল, ব্যাটারি ইন্ডিকেটর চলে গেল হাই-এর দিকে, ফুয়েল গজ বলে দিল দুটো ট্যাঙ্কই ভরা।

আগেই খেয়াল করেছে ও একপাশের ভিড়ানো একটা দরজা দিয়ে সামান্য ধোঁয়া বের হচ্ছে। কেউ না কেউ আছে ও-ঘরে।

বাইরে কয়েকটা স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিনের জোরাল আওয়াজ শুনতে পেল ও, হ্যাঙ্গারকে পাশ কাটিয়ে গেল সেগুলো।

কী ঘটেছে টের পেলে এখানে আসতে দেরি করবে না লোকগুলো। এবার ওয়ালথার হাতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা। ছোট্ট একটা ঘর, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। গাঁজার গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল ওর।

একজনই মাত্র লোক আছে ঘরে। হাড্ডিসার লোকটা সরু একটা খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে গাঁজা টানছে, বিছানার পাশের টেবিলে একটা আধ-খালি হুইস্কির বোতল। এক পলকেই ঘরের ভিতরটা দেখা হয়ে গেল রানার। আলনায় ঝুলছে পাইলটের একটা ড্রেস।

'আপনি কপ্টার পাইলট?' মহা আনন্দের মাঝে হঠাৎ কথাটা শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুলল নেশাতুর লোকটা। রানার হাতের পিস্তলটা তার দিকে তাক করা দেখে হাত থেকে গাঁজা-ভরা জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল রোমশ বুকের উপরে।

'আইও, সব্বোনাশ!' বলে লাফ দিয়ে উঠল লোকটা, গা থেকে গাঁজার সিগারেট ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিছানা থেকে ওটা ঝেড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে রানার দিকে তাকাল নেশার ঘোর লাগা চোখে। 'কী ব্যাওয়ার?'

'আপনি পাইলট?'

'কী মনে হয়, বাওয়া? আমি হচ্ছি গিয়ে দুনিয়ার সেরা পাইলট লিওনার্দ বোর্দোঁ। কেন, চেনো না?' পাইলটের বোধহয় ধারণা হয়েছে ক্যাম্পের কেউ মস্করা করছে তার সঙ্গে।

'তা হলে আপনি পাইলট,' বলল রানা। 'এখন আপনাকে ফ্লাই করতে হবে। পারবেন তো?'

'নিশ্চয়ই!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল পাইলট। 'চার ছিলিম গাঁজা খেয়েও আমি···মাত্র তো তিনটে সিগারেট টেনেছি।'

'কপ্টার রেডি আছে, চলুন,' হাতের পিস্তল নাড়ল রানা।

'ওটা?' কেমন যেন বিদঘুটে হয়ে গেল পাইলটের চেহারা। 'ওটা তো নষ্ট!'

'ইন্সট্রুমেন্ট তা বলে না।' কড়া শোনাল রানার কণ্ঠ। 'উঠুন!'

'আমাকে মারলে কিন্তু কোথাও যেতে পারবেন না আপনি,' হুমকির সুরে বলল আধ-মাতাল পাইলট।

'তাতে আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই,' মৃদু হাসল রানা। 'আপনি তখন বেঁচে থাকবেন না।'

'অ্যাঁ? বেঁচে থাকব না? তা হলে আমার ডার্লিং জুলিয়া, রবার্টা আর ক্লডিয়া–ওদের কী হবে?'

যথেষ্ট বোঝা হয়ে গেছে রানার। মাথায় ওয়ালথারের এক বাড়ি দিয়ে মাতাল গাঁজাখোর পাইলটকে বিছানায় শুইয়ে দিল ও।

এই লোকের চেয়ে ও নিজে অপরিচিত মেশিন চালালেও দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক কম!

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রানা, কপ্টারের দিকে পা বাড়াল, ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যাঙ্গারের দরজার সামনে থামল একটা স্নো-ট্র্যাক। জানালা খোলা হলো ওটার। হেঁড়ে একটা গলা জিজ্ঞেস করল, 'মশিয়েঁ লিওনার্দ?'

'কেন বাওয়া জ্বালাচ্চিস?' পাইলটের জড়ানো গলা অনুকরণ করল রানা, সরে গেছে দরজার পাল্লার আড়ালে। 'কার কী ক্ষেতিটা করেছি আমি? এই মাত্র একটু নেশা করে...'

'একাই আছো?' যে জিজ্ঞেস করল তার পাশ থেকে খিঁকখিঁক করে হাসল আর কেউ।

'না,' জড়ানো গলায় উত্তর দিল রানা। 'আমার দু'পাশে চারটে সুন্দরী যুবতী রয়েচে।'

'কল্পনায় ওদেরকে আমার চুমু দিয়ো!' হ্যাঙ্গার ছাড়িয়ে রওনা হয়ে গেল স্নো-ট্র্যাক।

হ্যাঙ্গারের দরজা কিছুটা খোলা ছিল, পুরোটা খুলে দিল রানা, হাতে ওয়ালথার তৈরি, বিশ্বাস করতে পারছে না এতো সহজে লোকগুলো পাইলটের কথা বিশ্বাস করে চলে যাবে।

ফাঁকা হ্যাঙ্গার খাঁ-খাঁ করছে। পর-পর কয়েকটা স্নো-ট্র্যাক হ্যাঙ্গারকে পাশ কাটিয়ে গেল। আর বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপই লোকগুলো টের পেয়ে যাবে বিজ্ঞানীরা উধাও হয়েছেন।

কয়েক সেকেন্ড লাগল রানার প্রয়োজনীয় সুইচগুলো খুঁজে পেতে, তারপর খুবই সাবধানে কপ্টার উপরে তুলল ও। মাত্র আধফুট উপর দিয়ে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে এগোল যন্ত্রটা। বাইরে বেরিয়ে রোটর ফুল পিচে সেট করল রানা, রাতের আকাশে দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করল কপ্টার। বামদিক থেকে জোরাল বাতাস আসছে, আরেকটু হলেই হ্যাঙ্গারের ছাদের কিনারায় লেগে বরফে আছড়ে পড়ে চুরমার হতো কপ্টার, কিন্তু একটুর জন্য রক্ষা

পেয়ে গেল। কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশন নীচে পড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে দেখে মনে হচ্ছে ছোট হচ্ছে আকারে।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। পাইলট মাতাল গাঁজাখোর হলে কী হবে, বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিল। কপ্টারের ইঞ্জিন-অয়েল-ইন্ডিকেটর সতর্কতাসূচক লাল আলো দেখাতে শুরু করেছে, যে-কোন সময়ে ইঞ্জিন গরম হয়ে সিয্ হতে পারে। পরিণতি: নিশ্চিত ভাবেই মোটর বন্ধ হয়ে ক্র্যাশ!

পাঁচশো ফুট উপরে উঠে গেছে ওরা, ছুটছে মালয়েশিয়ান মেইন বেস লক্ষ্য করে।

দশ

কয়েক মিনিটেই পিছনে পড়ে গেল কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশন, রানওয়ের বাতিটাও আর চোখে পড়ছে না এখন।

আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা, কপ্টারের উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকালে বাতাসে ধেয়ে যাওয়া তুলোর মতো তুষার দেখা যায়। কয়েকশো ফুট নীচে বরফের টিলা আর ঢিবিগুলোকে আবছা, ধোঁয়াটে ঠেকছে।

কমিউনিকেশন রেডিও বন্ধ করে দিয়েছিল রানা, আবার চালু করল ওটা, মালয়েশিয়ান বেসে টিউন করল। কিছু শোনা গেল না। অনেক নীচ দিয়ে উড়ছে কপ্টার, দূরত্বও বেশি, ফলে কোন সাড়া নেই।

ন্যাভিগেশনাল এইড ট্র্যান্সমিটারের আওয়াজ বাড়াল রানা, এটাই এখন পথ দেখাবে। নিয়মিত বিরতি দিয়ে মোর্স কোডে ব্লিপ-ব্লিপ শব্দ করছে ওটা, হোমিং ডিভাইসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে।

রেডিও যোগাযোগ করতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে। সময় পাবে কি না জানে না রানা। ইঞ্জিন টেম্পারেচার গজ লালের ঘরে চলে গেছে। যে-কোন সময় বন্ধ হয়ে যাবে ইঞ্জিন।

কপ্টার নীচে নামাল রানা, মাত্র বিশ ফুট উপর দিয়ে ছুটছে এখন যন্ত্রটা। দ্রুত পিছনে সরে যাচ্ছে তুষারে ছাওয়া এবড়োখেবড়ো জমিন।

আর মাত্র পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা পর মনে মনে প্রার্থনা করল রানা। আর পনেরো মিনিট ইঞ্জিনটা ঠিক থাকলেই পৌঁছে যাবে ওরা মালয়েশিয়ান বেসে। কিন্তু সময় দিল না কপ্টার। ইঞ্জিনের গতি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করল। আরও নীচে নামল রানা, গতি কমিয়ে দিল। জানে ইমার্জেন্সি লোকেটর বিকন অন করলে অনায়াসে ওদের খুঁজে নিতে পারবে কবীর চৌধুরীর লোকেরা। কিন্তু তার মানে উদ্ধার নয়, মৃত্যু।

ইঞ্জিন টেম্পারেচার গজ এখন একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। কপ্টারের কেবিনের ভিতরটা গরম তেল আর তপ্ত ধাতুর গন্ধে ভরে উঠেছে। উসখুস করছেন বিজ্ঞানীরা। 'আর কতোদূর?' জিজ্ঞেস করলেন একজন।

'জানি না।' ইঞ্জিনের পাওয়ার ফুল করে দিল রানা, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না ইঞ্জিন। আরপিএম কমে আসছে দ্রুত। 'এখনও পনেরো-বিশ মাইল দূরে মালয়েশিয়ান বেস।'

কথাটা রানা মাত্র শেষ করেছে এমন সময়ে পিছনে ইঞ্জিনের ভিতরে ধাতব একটা কর্কশ শব্দ হলো। প্যানেলে একটা বাযার বেজে উঠল। 'আগুন ধরে গেছে,' কন্ট্রোল প্যানেলে এক হাত, অন্য হাতে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সুইচ অন করল রানা। 'নেমে

পড়তে হবে। বাকি পথ হেঁটে যাব আমরা।'

'এই আবহাওয়ায়?' জিজ্ঞেস করলেন এক বিজ্ঞানী।

'উপায় নেই।' তুষারে কপ্টার নামাল রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নামল ও। রানার তাড়ায় কপ্টারের কাছ থেকে সরে এলেন বিজ্ঞানীরা।

বিশগজও যেতে পারেনি কেউ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার কাজ না করায় তার আগেই বিস্ফোরিত হলো কপ্টারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মেশিনটা। পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে আকাশের গা চাটল কমলা আগুন। দ্রুত কমতে শুরু করল আগুনের শিখা, তুষারপাতের ভিতরে প্রায় নিভে গেল দু'মিনিট পুরো হওয়ার আগেই।

ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা গুলি করে বিজ্ঞানীদের শেকল ছিঁড়তে। কাজটা শেষ করবার পর এক সারিতে এগোল সবাই রানার পিছু পিছু। হাঁটু-সমান উঁচু তুষারের কারণে সামনে বাড়তে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বিরূপ আবহাওয়া, গন্তব্য এখনও অন্তত পনেরো মাইল দূরে। মালয়েশিয়ান বেসে ওরা পৌঁছতে পারবে সে-সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রত্যেকে পার্কার হুড শক্ত করে আটকে নিয়েছে। সাহস না হারাতে পরামর্শ দিল রানা। এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। বুঝিয়ে দিল যতোক্ষণ ওরা হাঁটবে ততোক্ষণ জমে গিয়ে মারা পড়বার সম্ভাবনা নেই।

একটা ঢালের উপর উঠে থেমে পিছনে তাকাল রানা, মনে হচ্ছে যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হাঁটছে। কপ্টারটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু আগুনের ক্ষীণ শিখা। বড়জোর মাত্র এক মাইল পার হয়েছে ওরা!

বহুদূরে দু'বার দপদপ করে জ্বলে উঠল একটা আলো, তারপর নিভে গেল। ঠিক দেখেছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না রানা। কিছুক্ষণ পর আবারও দেখতে পেল। এবার আরও কাছে,

আরও নিচুতে।

এরপর বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে উঠল কপ্টার ইঞ্জিনের আওয়াজ। বিজ্ঞানীদের উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলল রানা, নিজেও শুলো। কপ্টারের আলোয় ওদের ফেলে আসা মেশিনটার ধ্বংসাবশেষ ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কয়েকটা আবছা মূর্তিকে নামতে দেখল রানা। কবীর চৌধুরীর লোকজন।

একটু পরেই আরও দুটো কপ্টার এসে হাজির হলো। একটা নামল প্রথমটার পাশে, অন্যটা ঝুলছে শূন্যে। সার্চ লাইটের উজ্জ্বল ধবধবে সাদা আলোয় রানাদের ফেলে আসা জ্বলন্ত কপ্টারটা তুষারপাতের ভিতরেও ঝলমল করছে।

লাশ না পেয়ে বেশিক্ষণ লাগবে না লোকগুলোর বুঝতে যে যান্ত্রিক ত্রুটিপূর্ণ কপ্টার মাটিতে নামিয়ে নিরাপদে পালিয়ে গেছে আরোহীরা। সেক্ষেত্রে সার্চ শুরু করবে লোকগুলো। এতোক্ষণে তাদের জানা হয়ে গেছে কে রানা, কেন জিজ্ঞেস করেছে সাবমেরিনের কথা, কী চায়।

কবীর চৌধুরীর লোকরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে ওদের ধরতে। তার মানেই হচ্ছে, ভাইরাস সরানোর সঙ্গে তারা জড়িত।

রানার হাতের ইশারায় উঠে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানীরা, ওর পিছু নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন তুষারের মধ্য দিয়ে। কষ্টকর যাত্রা, সেই সঙ্গে ঝড়ো হিমেল বাতাস এগিয়ে চলা আরও কঠিন করে তুলেছে। রানার মাথায় একটা পরিকল্পনা তৈরি হতে শুরু করেছে। বড় মাপের একটা জুয়া খেলবার ঝুঁকি নিতে হবে, কিন্তু তা ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না। মাত্র দেড় মাইল মতো পার হতে পেরেছে ওরা, আর কতোদূরে যেতে পারবে? পায়ে হেঁটে মালয়েশিয়ান বেসে পৌঁছানোর চেয়ে কম ঝুঁকি নেওয়া হবে কাজটা করলে।

প্রথমে ত্রুটিপূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত কপ্টারের সঙ্গে যতোটা সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সার্চের এলাকা অনেক বেশি বিস্তৃত হয়,

একটার সঙ্গে আরেকটা কপ্টারের দূরত্ব যতো বাড়ে ততোই মঙ্গল।

এখন রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই তুষারে ঢাকা ঢালটা ক্রমে নিচু হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো রানার পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ও, পা বাড়ালেই পড়ে যাবে গভীর কোন খাদে।

কিন্তু ফিরে যাওয়া মানেই ধরা পড়া, এবং নির্দিষ্ট সময়ে কবীর চৌধুরীর হাতে খুন হয়ে যাওয়া। তার বদলে একটা সুযোগ পাচ্ছে ও, তা যতোই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন।

হাতের ইশারায় বিজ্ঞানীদের নিয়ে সামনে বাড়ল ও।

ঢাল কোথাও কম আবার কোথাও অপেক্ষাকৃত খাড়া। আরও এক মাইল মতো পেরোনোর পর রানা টের পেল, উপকূলের মালয়েশিয়ান বেস থেকে এগিয়ে আসা একটা তুষারে ঢাকা ঢালু সমতল ভূমিতে আছে ওরা।

পরবর্তী ঢালে উঠে পিছনের অন্ধকারে চোখ বুলাল রানা। অনেকখানি ডানদিকে একটা কপ্টারের আবছা হলদে আলো দেখতে পেল, এছাড়া চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সার্চ শুরু করে দিয়েছে কবীর চৌধুরীর লোকরা। এখন তারা জানে বিজ্ঞানীদের নিয়ে পালিয়েছে রানা, বেশি দূর যেতে পারেনি, ধারেকাছেই কোথাও আছে।

পরের ঢাল ধরে নামতে শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা রানার পিছনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের তলায় বরফ হারালেন সব ক'জন। নরম তুষারে গড়িয়ে নীচে নামছে দেহগুলো। পঞ্চাশ গজ গড়িয়ে থামল সবাই ঢালের গোড়ায়, হাঁপাচ্ছে আতঙ্কে।

চমকে গেছে রানা, কিন্তু ভয় পায়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে উঠে দাঁড়াল ও, বিজ্ঞানীদের দাঁড়াতে সাহায্য করল। খুব কাছে চলে এলো একটা কপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ। আবার বরফে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল ওরা।

যা ঘটবার তা-ই ঘটবে এখন। ত্রুটিপূর্ণ কপ্টার থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে আসবার চেষ্টা করেছে রানা, কিন্তু দূরত্ব যথেষ্ট হয়নি। তবে এখন আর কিছু করবার নেই।

বিশ ফুট উপর দিয়ে সার্চ লাইট জ্বেলে পার হয়ে গেল কপ্টার, ওটার রোটর বাতাসের ঝাপ্টা দিয়ে প্রচুর তুষার উড়াল। বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে উঠল সবাই।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ফিরে এলো কপ্টারটা, অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে ওটার সার্চ লাইট। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা রানার উপরে এসে স্থির হলো আলোটা। বাতাস এতোই শীতল যে পার্কা ভেদ করে কামড় বসাচ্ছে শরীরে, চিন্তা করতে দিচ্ছে না।

কাছেই নামল কপ্টার। দু'মিনিট পর রানাকে ধরে চিত করা হলো, চোখে ফেলা হলো টর্চের উজ্জ্বল আলো।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা। সম্ভবত দু'জন এসেছে, একজন ওর পকেট সার্চ করতে ব্যস্ত। ওয়ালথারটা সাবধানে বের করে আনল রানা, দেহের পিছনে লুকিয়ে রাখল। দু'জন ধরে আছে ওকে, ওঠাতে চেষ্টা করছে। একজন ওর হাত থেকে ওয়ালথারটা ছাড়িয়ে নিল। শরীর শিথিল করে রাখল রানা।

'একটাকে পেয়েছি,' কপ্টারের দিকে যেতে যেতে সঙ্গীকে বলল একজন। 'বাকিগুলো ধারেকাছেই থাকবে।'

'এটাই আসলটা,' বলল তার সঙ্গী। 'বস্ এটাকেই খুঁজছিলেন।'

'অস্ত্র নেই তো ওর কাছে?' কপ্টারের ভিতর থেকে চিৎকার করল কে যেন।

'না,' জবাব দিল প্রথমজন। 'ওটা আমার হাতে।'

কপ্টারের পিছনের সিটে ধরে ধরে ওঠানো হলো রানাকে, সিটবেল্ট বেঁধে ফেলা হলো। মাথাটা হেডরেস্টে হেলান দিয়ে রাখল রানা, এখনও জড়ানো নিচু গলায় কী যেন বিড়বিড় করছে।

'রেড লিডার ওয়ান,' পাইলট রেডিওতে জানাল। 'আমরা

পালের গোদাটাকে পেয়েছি। বাকিগুলোও আশেপাশেই পেয়ে যাব।'

'সাবধান, ব্রাসি, লোকটা বিপজ্জনক,' রেডিওতে সতর্কবাণী শোনা গেল।

জবাব দিল পাইলট। 'ওর অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে। লোকটার জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে।'

'ওকে আর বিজ্ঞানীগুলোকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে ধরে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দেয়া হলো। 'আমরা ফিরছি তা হলে। চটপট কাজ সারো।'

'ওভার।'

বিজ্ঞানীরা তিন মিনিটের মাথায় একে একে বন্দি অবস্থায় ফ্যাকাসে মুখে কপ্টারে উঠলেন। নিজের সিটে গিয়ে বসল কো-পাইলট। কপ্টার মাটি থেকে উঠবার পর চোখ আরেকটু খুলল রানা, পাশের সিটে বসে আছে এক সশস্ত্র প্রহরী। সামনে বামদিকে পাইলট আর ডানদিকের চেয়ারে কো-পাইলট, দু'জনেরই কোমরের হোলস্টারে রিভলভার। চোখ প্রায় বন্ধ রাখা অবস্থায় বিজ্ঞানী তিনজন এবং এরা ছাড়া কপ্টারে আর কাউকে দেখতে পেল না রানা।

নিজেকে জিজ্ঞেস করল, শত্রুপক্ষের সবাইকে মেরে ফেলতে বাধবে ওর? না। উত্তরটা স্পষ্ট অনুভব করল রানা অন্তরে। মালয়েশিয়ান ইন্সটলেশনে একত্রিশ জন নিরীহ মানুষ মারা গেছে, সেসব মৃত্যুর সঙ্গে এরাই জড়িত। আরভিবি-এ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। আরভিবি-এ-র হাতবদল ঠেকাতে হবে যে-করে হোক। কবীর চৌধুরী কী করতে যাচ্ছে কে জানে! বাংলাদেশকে জনশূন্য করে দিতে চাইলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই!

ছোট একটা এয়ার পকেটে পড়েছে কপ্টার, ঝাঁকি খেল। ঠিক ওই সময়টাকেই বেছে নিল রানা, সিটবেল্ট খুলে সামনের দিকে

ঝুঁকে পড়ল। পাইলটের প্রায় পিছনে চলে এসেছে ও হাতে বেরিয়ে এসেছে স্টিলেটো, ডান হাতে হালকা ভাবে ধরে থাকল ওটা।

পাশের সিটে বসে থাকা সশস্ত্র লোকটা ঝুঁকল রানাকে ধরে আবার সিটে বসাতে। পরপর দু'বার বাম হাতের জোরাল ঘুসি মারল রানা লোকটার নাকে-মুখে। ঝাঁকি খেয়ে পিছনে চলে গেল প্রহরীর মাথা, কপ্টারের পিছনের ফ্রেমের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

কো-পাইলট নিজের সিটে ঘুরে বসতে শুরু করেছে, এক হাতে তুলে আনছে সার্ভিস রিভলভার। চট করে সামনে বাড়ল রানা, পাইলটের চিবুকের নীচে ঠেসে ধরল চোখা স্টিলেটোর ডগা। কো-পাইলটকে বলল, 'অস্ত্রটা ফেলে দিন, নইলে আপনার পাইলট মারা পড়বেন!'

দ্বিধায় ভুগল কো-পাইলট, হেলান দেওয়ার কুশনের কারণে এখনও রিভলভারটা তাক করতে পারেনি সে।

'যা বলছি করুন!' কর্কশ শোনাল রানার গলা। 'নইলে আমরা সবাই মারা যাব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কো-পাইলট, রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে ঘুরতে শুরু করল সামনের দিকে। চট করে রিভলভার কুড়িয়ে নিল রানা, ইশারা করল কো-পাইলটকে, 'চুপ করে বসে থাকুন।' ওর পাশের প্রহরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তার দিকে একবার তাকাল কো-পাইলট, তারপর নির্দেশ পালন করল। ছানাবড়া চোখে চেয়ে রয়েছেন তিন বিজ্ঞানী।

পাইলটের রিভলভারটা বের করে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজল রানা। হাতের রিভলভারটা পাইলটের পিঠে তাক করল এবার 'মরবেন চালাকি করতে গেলে,' বলল ও। 'আমি যা বলব তা না শুনলে কেউ বাঁচতে পারবেন না।'

'কী চান?' ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল পাইলট।

জবাবে ডানদিকে ঝুঁকল রানা, অজ্ঞান প্রহরীর কাছ থেকে নিজের ওয়ালথার আর তার পিস্তলটা সংগ্রহ করে নিল। এবার বলল, 'সোজা মালয়েশিয়ান বেসে আমাদের নিয়ে যাবেন আপনারা। কোর্স ঠিক করে নিন এক্ষুণি!'

পরস্পরের দিকে তাকাল পাইলট আর কো-পাইলট। ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইলট। ডানদিকে কাত হলো কপ্টার, দীর্ঘ একটা বাঁক নিয়ে ছুটতে শুরু করল নতুন গন্তব্যে।

'মালয়েশিয়ান বেসে রেডিও টিউন করুন,' নির্দেশ দিল রানা।

সামান্য দ্বিধার পরে রিটিউন করল কো-পাইলট

'মাইক্রোফোনটা আমাকে দিন,' খালি হাতটা বাড়াল রানা। 'সাবধান!'

মাইকটা রানার হাতে দিলো কো-পাইলট। ঠোঁটের কাছে ওটা ধরল রানা।

'মালয়েশিয়ান বেস, মালয়েশিয়ান বেস, শুনতে পাচ্ছেন?'

স্ট্যাটিকের কর্কশ আওয়াজ ছাড়া রেডিওতে আর কোন শব্দ নেই।

'কপ্টার আরও ওপরে তুলুন,' নির্দেশ দিল রানা।

থ্রটল টেনে কপ্টার আরও উপরে তুলল গম্ভীর পাইলট।

আবার মাইকে কথা বলল রানা। 'মালয়েশিয়ান বেস, মালয়েশিয়ান বেস, শুনতে পাচ্ছেন? ওভার।'

'মালয়েশিয়ান বেস-ইন্সটলেশন,' জবাব দিল একটা কণ্ঠ। 'আপনার আইডেন্টিফিকেশন দিন।'

'মালয়েশিয়ান বেস, আমি কর্নেল মাসুদ রানা। কমিশনের সঙ্গে আছি। কর্নেল তিব্বত মাহমুদের সঙ্গে।'

'রজার, কর্নেল। বারো ঘণ্টা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। স্ট্যাটাস বলুন। কর্নেল মাহমুদ আপনার সঙ্গে আছেন?'

'না। নেগেটিভ। যা বলছি খুব সাবধানে শুনুন। কর্নেল তিব্বত মাহমুদ মারা গেছেন। আমি এখন আছি একটা প্রাইভেট ওয়েদার কোম্পানির কপ্টারে, আপনাদের থেকে দশ মাইল দূরে। এরাই সবকিছুর জন্যে দায়ী। পাইলট আর কো-পাইলটকে অস্ত্রের মুখে নির্দেশ পালন করাতে হচ্ছে। তৃতীয় লোকটা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। এয়ারস্ট্রিপের ঠিক মাঝখানে নামব আমরা। আর্মড এসকর্ট দরকার হবে। আমার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নীরব থাকল রেডিও, তারপর অন্য একটা গলা শোনা গেল। 'কর্নেল রানা, আমি মেজর সাফায়েত বলছি। আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?'

'নেগেটিভ, মেজর। আর্মড গার্ড দরকার আমার। সেই সঙ্গে একটা ফুয়েল ট্রাক। নামার পরেই এদের আমি ফেরত পাঠাতে চাই। বুঝতে পারছেন?'

'আই আই, কর্নেল। তবে আপনি ঠাট্টা করলেই খুশি হতাম।...প্রাইভেট কোম্পানিটার নাম?'

'কে কে। কবীর চৌধুরী আর খায়রুল কবীরের ওয়েদার ফোরকাস্ট স্টেশন এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টার।'

'কবীর চৌধুরী? সেই কুখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী?'

'হ্যাঁ। ঠাট্টা করছি না আমি বুঝতেই পারছেন। সিগনাল পাঠান।' জোরাল হয়ে উঠল ট্রেসিং ব্লিপ।

'রাডারে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের। আর আট মাইল দূরে আছেন।'

মাইক্রোফোনটা কো-পাইলটের হাতে ধরিয়ে দিল রানা. সতর্ক করল, 'কোন চালাকি নয়। ঠিক রানওয়ের মাঝখানে নামবে কপ্টার। ওখানে একদল সশস্ত্র প্রহরী বিজ্ঞানীদের বুঝে নেবে। রিফুয়েল করা হবে আপনাদের মেশিন, তারপর নিজেদের বেসে ফিরে যেতে পারবেন আপনারা। কি বলেছি পরিষ্কার বুঝেছেন?'

'ডা.' জানাল রাশান পাইলট। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল কো-পাইলট।

পরবর্তী কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল, তারপর কো-পাইলটের শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সামনে ঝুঁকল রানা। সামনের ক্যানোপি দিয়ে নীচে তাকালে এখন দেখা যাচ্ছে মালয়েশিয়াম বেসের উজ্জ্বল আলো।

'সাবধান!' সতর্ক করল রানা।

ডানদিকে বসা কো-পাইলটের দিকে তাকাল পাইলট, দু'জনই মাথা দোলাল।

'কর্নেল রানা?'

'বলুন।'

'আমি...আমরা আর মিস্টার চৌধুরীর ইন্সটলেশনে ফিরতে চাই না।'

'বিশ্বাসঘাতকতা করবেন? সেটা কি ঠিক হবে?'

'আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব। কারও পক্ষে নেই। বাড়ি ফিরতে চাই আমরা।'

'আপনাদের সঙ্গের গার্ড, তার কী হবে?'

'সে-ও আমরা যা করব তা-ই করবে। গত চার বছর আমরা ছুটি পাইনি, কর্নেল।'

কয়েক মিনিট পর এয়ারস্ট্রিপের উপর পৌঁছল কপ্টার। নীচে ছয়-সাতটা স্নো-ট্র্যাক দেখতে পেল রানা। ওগুলোর দুই পাশে অন্তত পনেরোজন সশস্ত্র লোক।

রানওয়ের ঠিক মাঝখানে কপ্টার নামাল পাইলট, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে রানার দিকে তাকাল। ততোক্ষণে কপ্টারটাকে ঘিরে ফেলেছে সতর্ক আর্মড গার্ডরা।

দরজা খুলল রানা। বাতাসের কারণে চিৎকার করতে হলো ওকে। 'আমি কর্নেল মাসুদ রানা!'

'সাবধানে ধীরে ধীরে কপ্টার থেকে বের হন,' পাল্টা চিৎকার

করল এক সৈনিক।

'আসুন,' বিজ্ঞানী আর পাইলটদের ইশারা করল রানা, বেরিয়ে এলো দরজা আরও একটু খুলে।

'আমাদের সাহায্য করবেন তো?' পাইলটের গলা উদ্বিগ্ন শোনাল।

'আগে কথা বলে দেখি,' জানাল রানা।

কো-পাইলট অজ্ঞান লোকটাকে নিয়ে বের হলো। কর্নেল তিব্বত মাহমুদের সঙ্গে ওকে দেখেছে এমন একজন বয়স্ক অফিসার এগিয়ে এলেন রানার দিকে, নিজের পরিচয় দিলেন, মেজর সাফায়েত জামিল। চোখে-মুখে খেলা করছে নির্জলা বিস্ময়।

'আল্লাহ্! তা হলে সত্যিই আপনি! এলেন কোত্থেকে?'

'প্রাইভেট ইন্সটলেশনে গিয়েছিলাম। ওয়েদার আর স্পেস রিসার্চ নিয়ে কাজ করার কথা যেটার।'

'কিন্তু...'

তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'এখন ব্যাখ্যা করার সময় নেই, মেজর। কপ্টারটাকে চোখের আড়ালে কোথাও সরিয়ে ফেলুন।' পাইলটদের দেখাল। 'এদের আমি ইন্টারোগেট করতে চাই, একটা ঘর লাগবে সে-জন্যে। আর বিজ্ঞানীদেরও বিশ্রাম দরকার। এঁদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। ভাল হয় একজন ডাক্তার সবাইকে পরীক্ষা করে দেখলে। আগে কমিউনিকেশন সেন্টারে একবার যাব আমি। ওখানে যদি পারেন তা হলে খাবারের ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।'

বড় বড় চোখ করে ওর কথা শুনছিলেন অফিসার, এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু, কর্নেল?'

'হ্যাঁ, এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বোতল ব্র্যান্ডি। জলদি করুন, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। যে-কোন সময় এখানে আমাকে খুঁজতে আসবে কবীর চৌধুরীর লোকজন।'

ঘন ঘন মাথা দোলালেন অফিসার। 'তোমরা সবাই শুনেছ কর্নেল রানা কী বলেছেন। কপ্টার সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করো। মোস্তাফিজ, তুমি বিজ্ঞানীদের সবাইকে নিয়ে অ্যাডমিন বিল্ডিঙের কনফারেন্স ঘরে যাও। ডাক্তার দেখাবে সবাইকে, খাবারের ব্যবস্থা করবে।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে কমিউনিকেশন সেন্টারে নিয়ে যাব।'

মেজর সাফায়েতকে অনুসরণ করে একটা স্নো-ট্র্যাকের পাশে চলে এলো রানা। দু'জন উঠবার পর তুষারের উপর দিয়ে যন্ত্রটা ছুটালেন অফিসার। 'এবার বলবেন কি ঘটেছে, কর্নেল? আগে বলুন কর্নেল মাহমুদ কোথায়।'

'উনি মারা গেছেন,' বলল রানা। 'খুন করা হয়েছে তাঁকে।'

'আল্লাহ্! হচ্ছেটা কী ওখানে?'

'এখানে আপনাদের সঙ্গে সৈন্য আছে কয়জন?' কাজের কথা পাড়ল রানা।

ওর দিকে তাকালেন অফিসার। 'বাইশজন। সবাইকে আপনি দেখেছেন।'

'আর কোন অস্ত্র নেই রাইফেল ছাড়া?'

'গ্রেনেড আছে। বেশিরভাগই এখানে বিজ্ঞানী। তাঁরা লড়তে পারবেন না।'

'তা হলে যাদের লড়ার সামর্থ্য আছে তাদের প্রস্তুতি নিতে বলেন। আমি আশঙ্কা করছি আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে কবীর চৌধুরীর লোক হানা দেবে। প্রাইভেট ইন্সটলেশনের দিকে খেয়াল রাখা দরকার। রাডারের দায়িত্বে যে আছে তাকে সতর্ক করতে হবে।'

'আমাদের বেসে কেউ এভাবে আসবে না,' প্রতিবাদের সুরে বললেন অফিসার। 'এ স্রেফ অসম্ভব।'

'আসবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আমাকে খুঁজতে ওদের আসতেই হবে।'

'তারপর?'

'এসে পাবে না। তার আগেই চলে যাব আমি। এজন্যে ভাল একটা স্নো-ট্র্যাক দরকার হবে আমার, সেই সঙ্গে রাইফেল-অ্যামিউনিশ্যন, রেডিও ট্র্যান্সিভার, হোমিং ডিভাইস আর সার্ভাইভিং গিয়ার। রিসার্চ ইন্সটলেশনে ফিরে যাব আমি।'

'ঘটছে কী আসলে, কর্নেল রানা?' আবারও জানতে চাইলেন অফিসার। 'কর্নেল মাহমুদকে কে খুন করেছে?'

কমিউনিকেশন সেন্টারের সামনে চলে এসেছে ওরা, জবাবটা দিল না রানা। বলল, 'একটা মেসেজ পাঠাতে হবে আমাকে। আমি যতোক্ষণ ব্যস্ত থাকি তার মধ্যেই আশা করি যা যা চেয়েছি যোগাড় করতে পারবেন আপনি। কাজটা সেরেই তিন বন্দির সঙ্গে কথা বলব আমি। তারপরও যদি হাতে সময় থাকে তা হলে আপনাকে সব খুলে বলব।'

সামান্য দ্বিধায় ভুগে মাথা দোলালেন অফিসার। 'ঠিক আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছি আপনার ধারণা ভুল হোক।'

'আমিও তা-ই চাই,' শুকনো মুখে বলল রানা। 'যাবার আগে আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার। সৈন্যদেরকেও দরকার হবে।'

এগারো

কমিউনিকেশন রুমের দরজাটা খুলে রানাকে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করলেন মেজর সাফায়েত। চেয়ারে ঘুরে তাকাল

রেডিওম্যান। তাকে পাশ কাটাল রানা, এনক্রিপশন মেশিন আর টেলিটাইপ মেশিনগুলো ঘর ভরে রেখেছে।

'ইনি কর্নেল মাসুদ রানা,' পরিচয় দিলেন মেজর সাফায়েত। 'আমাদের ইনভেস্টিগেটর। টপ ক্লিয়ারেন্স। যা বলেন শোনো।'

'ইয়েস, সার,' বুক টানটান করল যুবক রেডিওম্যান, রানার দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকাল।

মেজর সাফায়েত জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল রানা, আপনার চাহিদামত সবকিছু নিয়ে আসতে আধঘণ্টা লাগবে আমার, এর মধ্যে আপনার কাজ শেষ হবে?'

'হবে। সৈন্যদের জড়ো করুন। অ্যালার্ট থাকতে বলবেন। বন্দি তিনজনকে জিজ্ঞেসাবাদ শেষ করেই সবাইকে ব্রিফ করব আমি।'

'গোলাগুলি হবে?'

'মনে হয় না, যদি না আপনারা বাড়াবাড়ি করেন। ওরা যখন বুঝবে আমি এখানে নেই তখন স্বেচ্ছায় চলে যাবে।' ইকুইপমেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'এবার আপনাকে দরকার হবে আমার,' রেডিওম্যানকে বলল ও।

'ইয়েস, কর্নেল!' রেডিওম্যান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিলেন মেজর সাফায়েত।

'ওঁর নির্দেশ ঠিক মতো পালন করবে।' কথা শেষ করে ঘুরে চলে গেলেন তিনি পিছনে দরজা বন্ধ করে।

'যোগাযোগের উপায় কী?'

'তিনটে, সার। একটা কম্পিউটার ডাটা লিঙ্ক, রেডিও, অন্যটা টেলিটাইপ।'

'টেলিটাইপ সার্কিট এখন কেউ ব্যবহার করছে?'

শব্দ করছে একটা মেশিন, সেটার দিকে ঘাড় ফিরাল রেডিওম্যান। 'ইয়েস, সার।'

'তা হলে বন্ধ করে দিন। লাইন খালি চাই আমি। রুটিন

ইন্ডিকেশন লিখে দিচ্ছি।'

'ব্যাপারটা কী হচ্ছে একটু বলবেন, কর্নেল?'

'লাইন খালি করুন। আমার কাজ শেষ হওয়ার পর ব্যারাকে ফিরে বসে থাকবেন চুপচাপ পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।'

'ইয়েস, সার।' একটা ইকুইপমেন্টের সামনে চলে গেল কৌতূহলী যুবক, কয়েকটা সুইচ অন অফ করল, তারপর যে টেলিটাইপ মেশিনটা কিটিরকিটির আওয়াজ করছিল ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখন কোন আওয়াজ করছে না মেশিনটা।

রানার লেখাটা পেয়ে সেই অনুযায়ী ম্যানুয়ালি বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে। টেলিটাইপ মেশিনের সামনে বসল রানা। 'দাঁড়ান এখানে। বুঝিয়ে বলবার সময় নেই। কী করছি পড়ে নেবেন।'

টাইপ করতে শুরু করল ও। এক নাগাড়ে দ্রুত টাইপ করে চলেছে, বাদ দিচ্ছে না কিছুই। শুরু থেকে কী-কী ঘটেছে লিখছে। কবীর চৌধুরীর উপস্থিতি এবং ভাইরাস চুরি এবং তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা লিখে থামল। পনেরো মিনিট লাগল। পুরোটা সময় চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে থাকল রেডিওম্যান।

'মেসেজ পাওয়া গেছে,' একটু পরে জবাব এলো। 'চীফ জানতে চান কবীর চৌধুরি কী করতে চায় বলে আপনার ধারণা।'

'সাবমারসিবলে ভাইরাস ওঠাতে চেষ্টা করবে সে যে-করে হোক। নিজের উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্যে মালয়েশিয়ান মেইন ইন্সটলেশনে সে হামলা করলেও অবাক হবো না আমি।'

'হোল্ড,' টেলিটাইপ কিটিরকিটির করতে শুরু করল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল রানা। বিসিআইয়ের ব্যস্ততা মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে। নিশ্চয়ই কপালের শিরা তিরতির করে কাঁপছে বুড়োর। ক্ষুরধার মগজটা ব্যস্ত হয়ে আছে সমস্যা সমাধানের কাজে।

দশ মিনিট পরে বাযার বেজে উঠল। যুবক রেডিওম্যান উঠে গিয়ে খুলে দিল দরজাটা. এক হাতে একটা লাঞ্চ বক্স আর অন্য হাতে একটা ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মেজর সাফায়েত। জিনিসগুলো ডেস্কের উপরে রেখে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

'কয়েকটা স্যান্ডউইচ ছাড়া আর কিছু পেলাম না। আধঘণ্টা পর ব্রেকফাস্ট। খেয়ে যেতে পারবেন আপনি।'

'আর যা কিছু চেয়েছিলাম সেগুলো পেয়েছেন?'

টেলিটাইপ মেসেজের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন মেজর, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে টেলিটাইপ। 'যেমন করে হোক ঠেকাতে হবে কবীর চৌধুরীকে। প্রয়োজনে মালয়েশিয়ান আর্মির সাহায্য নেওয়া যাবে। কী করবে সেটা জানাও।'

মেসেজটা পড়েছেন মেজর, নিচু স্বরে শিস বাজিয়ে বললেন, 'আমাদের পর্যাপ্ত সৈন্য নেই।'

'যে ক'জন আছে তাদের নিয়েই কাজটা করতে হবে। শেষবারের মতো টাইপ করল রানা, 'সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে।'

গুডলাক, টেলিটাইপ মেশিন থেকে প্রিন্ট বের হলো।

দীর্ঘ মেসেজ শিট টেনে বের করল রানা, ওটা কয়েক ভাঁজ করে মেজরের হাতে দিয়ে বলল, 'টপ সিক্রেট। কাগজটা এক্ষুণি নষ্ট করে ফেলুন।'

ডেস্কে রাখা একটা পোর্টেবল শ্রেডারের ভিতর কাগজটা দিয়ে ফালি ফালি করে ফেললেন মেজর।

'এবার আবার ট্রাফিক শুরু করব, সার?' জিজ্ঞেস করল রেডিওম্যান। মেজর সাফায়েতের দিকে তাকাল, তিনি আস্তে করে মাথা দোলালেন।

লাঞ্চ বক্স আর ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'আসুন, মেজর, আমার সঙ্গে।'

একসঙ্গে দু'জন স্নো-ট্র্যাকে উঠল ওরা। ওটার পিছনে রাখা হয়েছে রানার বলে দেওয়া জিনিসগুলো। 'ব্রিফিঙের জন্যে সবাই তৈরি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবাই কনফারেন্স রুমে।'

'ঠিক আছে। আগে কবীর চৌধুরীর লোকদের সঙ্গে কথা বলব।'

মেশিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন মেজর। স্বাদহীন দুটো স্যান্ডউইচ আর একটা চকোলেট বার গলা দিয়ে ভিতরে ঠাঁসল রানা। খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাডমিন বিল্ডিঙের সামনে থামল স্নো-ট্র্যাক। ভিতরে ঢুকে কর্নেল তিব্বত মাহমুদের অফিসের পাশের ছোট একটা ঘরে ওকে নিয়ে এলেন মেজর।

ভিতরে ঢুকবার আগে রানা জিজ্ঞেস করল, 'রাডারে কিছু ধরা পড়েছে?'

'এখনও কিছু নেই,' জানালেন মেজর। 'হয়তো ওরা আসবে না।'

'আসবে,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। কবীর চৌধুরীকে ও চেনে। সহজে হার মানবে না পাগল বৈজ্ঞানিক। সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও দূর থেকে নির্দেশ দেবে, যে-করে হোক রানাকে বন্দি করতে হবে। সে জানে, রানা সক্রিয় থাকলে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেই। সে-ঝুঁকি নেবে না সে।

ছোট একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে পাইলট, কো-পাইলট আর গার্ড। এই মাত্র রানার মতোই বিস্বাদ স্যান্ডউইচ শেষ করেছে। কেউ একজন তাদের জন্য এক বোতল ভদকা যোগাড় করে দিয়েছে, সেটায় পালা করে চুমুক দিচ্ছে তিনজন।

ওরা ভিতরে ঢুকতেই চোখ তুলে তাকাল সবাই। রানাকে চিনতে দেরি হলো না। একটা চেয়ার টেনে বসল রানা, পরিষ্কার গ্লাসে দু'পেগ ব্র্যান্ডি ঢেলে চুমুক দিল, তারপর একে একে তাকাল তিন বন্দির দিকে। মেজর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনাদের ব্যাপারে আমরা কী সিদ্ধান্ত নেব সেটা ঠিক করার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার,' ব্র্যান্ডির গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'আপনি যা বলেন, কর্নেল।'

'বেশ। মাউন্ট স্যাবিনের নীচে উপকূলে একটা সাবমারসিবল আসার কথা। ওটার ব্যাপারে কী জানেন আপনারা?'

একে অপরের দিকে তাকাল তিন বন্দি। 'কিছু না, কর্নেল। এই প্রথম শুনলাম।'

'আমিও জানি না।'

'আমিও না।'

লোকগুলো সত্যি বলছে বলেই মনে হলো রানার। 'গত কয়েকদিন আপনাদের ইন্সটলেশনে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছেন?'

মাথা দোলাল তিনজনই। 'ব্যস্ততা বেড়ে গেছে,' জানাল কো-পাইলট।

'কী ধরনের ব্যস্ততা?'

কাঁধ ঝাঁকাল কো-পাইলট। 'গার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বাড়তি স্নো-ট্র্যাক নামানো হয়েছে। স্নো-ট্র্যাকগুলোর কয়েকটা চলে গেছে কোথায় যেন।'

'কেউ কোন ব্যাখ্যা দেয়নি?'

'না।'

'বিজ্ঞানীরা? তাঁদের ব্যাপারে কী জানেন বলুন।'

'বেসে এখন বিজ্ঞানী প্রায় নেই বললেই চলে।' সামনে ঝুঁকে বসল পাইলট।

'কী হয়েছে তাদের?'

'একমাস আগে থেকে মিস্টার চৌধুরীর আদেশে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। বদলে আর কেউ আসেনি।

আমাদের বলা হয়েছে ওয়েদার ফোরকাস্ট করার জন্যে কয়েকজন ছাড়া বাকিদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ইন্সটলেশন প্রায় বন্ধই করে দেবেন মিস্টার চৌধুরী।'

ভাইরাসটা হাতে পাবে, বুঝে ফেলেছিল পাগল বিজ্ঞানী? এখন শুধু জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, এবং ব্যবহার করা। কী চায় কবীর চৌধুরী? টাকা হতে পারে না। টাকা তার যথেষ্টরও বেশি আছে। আবার কি জনসংখ্যা কমিয়ে পৃথিবীকে আদর্শ স্বর্গ বানাবার চিন্তা কাজ করছে উন্মাদ লোকটার মাথায়? তা হলে বাংলাদেশের কপালেই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ আছে। আরভিবি-এর কোন অ্যান্টিডোট নেই! বাংলাদেশের উপরে মহা ক্ষ্যাপা খেপে আছে লোকটা।

'মাউন্ট স্যাবিনের নীচে কবীর চৌধুরীর আরেকটা ইন্সটলেশন আছে, জানেন?'

'জী। ওটা তাঁর বিশ্রামের জায়গা।'

'জেটি আছে ওখানে?'

'আছে। তবে এখন বরফের কারণে ওটা ব্যবহার করা যাবে না।'

আরেক ঢোক ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল রানা। এদের কাছে আর কোন তথ্য নেই। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'জেন্টলমেন, আপনাদের সৌভাগ্য দেখতে পেলে খুশি হতাম, কিন্তু বদলে আশঙ্কা হচ্ছে। আপনাদের লোকরা আমাকে বন্দি করতে চায়। আমার বিশ্বাস তারা শীঘ্রি এখানে আসবে। ততোক্ষণে চলে যাব আমি। নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছি। কিন্তু তারা যখন আপনাদের এখানে দেখবে...' কথা শেষ করল না ও।

পরিণতি কী হতে পারে বুঝতে পেরেছে তিনজনই। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকগুলোর।

'সামনে দুটো পথ খোলা আছে আপনাদের,' আবার বলল রানা। 'এখানে থেকে যেতে পারেন, আমরা আপনাদের বন্দি

হিসেবে দেখিয়ে একটা ঘরে আটকে রাখব। আপনারা তখন দুর্ভাগ্যের শিকার, অনিচ্ছুক বন্দি। মুক্তি পাবার পরে বলার সুযোগ পাবেন যে আপনাদের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করা হয়েছে, কিন্তু আপনারা কোন তথ্য ফাঁস করেননি। সেক্ষেত্রে তৈরি হয়ে নিন, একজন একজন করে ঘুসি মেরে নিজেদের নাক ফাটিয়ে ফেলুন, দুটো একটা দাঁতও ফেলে দিতে পারেন। তাতে নিজেদের লোকদের প্রভাবিত করা সহজ হবে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিনজন। পাইলট জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মালয়েশিয়ান ইউনিফর্ম দেয়া যাবে?'

'যাবে।' এবার রানার সঙ্গে মেজর সাফায়েতও একমত হলেন।

'তা হলে আমরা থেকে যাব...' বলল পাইলট। 'চেষ্টা করে দেখব বাঁচতে পারি কি না। মিস্টার চৌধুরীর কাছে আমাদের নিয়ে গেলে স্রেফ মেরে ফেলার আদেশ দেবেন উনি।'

'একটা কথা, আপনাদের কিন্তু অস্ত্র দেব না আমরা,' বললেন মেজর সাফায়েত। 'বুঝতেই পারছেন।'

'বুঝেছি।'

'গুডলাক,' ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো রানা। মেজর একজনকে নির্দেশ দিলেন লোকগুলোকে মালয়েশিয়ান ইউনিফর্ম পরিয়ে ব্যারাকে নিয়ে যেতে।

কনফারেন্স রুমে ঢুকবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি আপনি নিউজিল্যান্ড যাচ্ছেন, কর্নেল?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। ওদের ভুল তথ্য দিয়েছি। সাবধানের মার নেই। আসলে রিসার্চ ইন্সটলেশনে ফিরব।'

ভিতরে ঢুকে রানার সঙ্গে একে একে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মেজর, কিন্তু রানা তাঁকে সময় দিল না। 'এখন ওসব থাকুক আপনারা কে আমি তা জানি না। তবে আমি কর্নেল মাসুদ রানা, বাংলাদেশী, মালয়েশিয়ার আমন্ত্রণে এখানে

কী ঘটছে দেখতে এসেছি। হয়তো আপনারা জানেন না, কর্নেল মাহমুদের সঙ্গে আমিও তদন্ত কমিশনে ছিলাম।'

সামনে ঝুঁকে বসলেন একজন সিভিলিয়ান। 'এখানে তা হলে আপনি কী করছেন, কর্নেল? আপনাদের কাজ ওখানে শেষ হয়ে গেছে? কী ঘটেছে জানতে পেরেছেন?'

'কর্নেল তিব্বত মাহমুদ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন আরেকজন।

'কর্নেল মারা গেছেন,' জানাল রানা।

'আল্লাহ্!' চেয়ারে হেলান দিলেন প্রথমজন। 'তা হলে যে জিনিস আমাদের রিসার্চ ইন্সটলেশনে অতোগুলো মানুষকে খতম করে দিয়েছে সেটা এখনও সক্রিয়?'

সবাই চুপ করবে সেজন্য অপেক্ষা করল রানা, তারপর ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। 'এখন আপনাদের আমি যা বলব সেটা টপ সিক্রেট। দেশের স্বার্থে মুখ বন্ধ রাখবেন আপনারা। আপনাদের জীবন এবং এই বেসে অন্য সবার জীবন নির্ভর করছে কথাগুলো বুঝে চলার ওপর। কী বলছি বুঝতে পারছেন?'

'বলুন?'

বিসিআইতে টেলিটাইপ করে যা জানিয়েছে সেটাই আবার বিজ্ঞানী ও সৈনিকদের বলল রানা। তৈরি থাকবে সবাই লড়াইয়ের জন্য, কিন্তু বাধ্য না হলে গোলাগুলি শুরু করবে না। কবীর চৌধুরীর লোকরা ওকে না পেয়ে চলে গেলে যাত্রার প্রস্তুতি নেবে মেজরের অধীনে। ঘড়ি দেখল ও। 'আর বেয়াল্লিশ ঘণ্টা পর ভাইরাস তোলা হবে সাবমারসিবলে। সেটা ঠেকাতে হবে আমাদের।' মেজরের দিকে তাকাল ও। 'মাউন্ট স্যাবিনের নীচে ঠিক চল্লিশ ঘণ্টা পর সমস্ত সৈন্য নিয়ে হামলা করব আমরা। ওখানে কবীর চৌধুরীর একটা ঘাঁটি আছে। ওটা দখল করে ভাইরাস ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করব। আমরা যদি ব্যর্থ হই তা হলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে ভয়ঙ্করতম দুঃস্বপ্ন।' মেজরের

সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নিল ও। 'ঠিক সময়ে ওখানে উপস্থিত চাই আপনাকে। আগেই রওনা দেবেন। হোমিং ডিভাইসের বীকন অন রাখবেন। আপনাদের আমি খুঁজে নেব।'

রানা থেমে যাওয়ার পর নীরবে থমথমে মুখে বসে থাকল সবাই, নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে।

নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন প্রথম বিজ্ঞানী। 'তা হলে হাতে সময় নেই মোটেই!'

তাঁর তাড়া দেখে চেয়ার ছাড়ল বাকিরাও। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কবীর চৌধুরীর সাবমারসিবলকে কীভাবে ঠেকাবেন, ঠিক করেছেন, কর্নেল রানা?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি বলতে কী, এখনও কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। চিন্তা করবেন না, কবীর চৌধুরীর লোকরা আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। ওরা শুধু আমাকে চায়। জরুরি ব্যাপার হলো তাদের বুঝিয়ে দেয়া যে আমি এখানে নেই।'

'সাধ্য মতো করব আমরা, কর্নেল,' কথা দিলেন মেজর সাফায়েত। 'আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।'

চুপ করে থাকল রানা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও, যা ওকে করতে হবে সেটা ওর একার পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। উপকূলে একটা সাবমারসিবল আসবে ভাইরাস নিয়ে যেতে, শুধু তা-ই নয়, কাজটা ঠিক মতো সারতে সতর্ক হয়ে থাকবে একদল সুদক্ষ ভাড়াটে সৈনিক। কোনও খুঁত রাখবে না কবীর চৌধুরী একবার বোকা বনেছে সে, রকেট নিয়ে আকাশে আটকা পড়ে, এবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে।

পাগলটাকে ঠেকাতে হবে যে-করে হোক। মালয়েশিয়ান সৈন্যরা কতোটা কাজে আসবে ও নিশ্চিত নয়। ঠিক সময়ে তারা না-ও পৌঁছুতে পারে। এখন পর্যন্ত ভাগ্য ওকে সহায়তা করছে,

কিন্তু আর কতোক্ষণ করবে কে জানে!

মেজর সাফায়েতের সঙ্গে অ্যাডমিন ভবনের সদর দরজায় চলে এলো রানা, এখানেই ওর জন্য স্নো-ট্র্যাক অপেক্ষা করছে।

'যদি ওরা জানে আপনি রিসার্চ ইন্সটলেশনের দিকে যাচ্ছেন তা হলে যে করে হোক ঠেকাবে,' বললেন মেজর। 'আমাদের রওনা হতে বলে মেসেজ পাঠাবেন আপনি?'

'না। ঊনচল্লিশ ঘণ্টা পরে মাউন্ট স্যাবিনের নীচে রঁদেভু হবে।' ঘড়ি দেখল গম্ভীর রানা, জিজ্ঞেস করল, 'আবহাওয়ার অবস্থা কী?'

'আগামী চল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষাকৃত ভাল থাকবে। তবে রস্ সাগরের একশো মাইল ভেতরে আরেকটা ঝড় তৈরি হচ্ছে।'

দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল ওরা। সরাসরি রানার চোখে তাকালেন মেজর। 'ইন্সটলেশনে আর যারা ছিল তাদের কী হয়েছে, কর্নেল?'

'ঠিক জানি না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে কালাহান তাদের পাহারায় আছে। সে আমেরিকান এজেন্ট, কবীর চৌধুরীর কেনা গোলাম। বিজ্ঞানীরা যদি বেরিয়ে যেতে চেষ্টা না করেন তা হলে সে কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

'আল্লাহ্ তা-ই করুন।'

'মেজর সাফায়েত, মেজর সাফায়েত, কল ৩১৫, কল ৩১৫,' জোরাল আওয়াজ ভেসে এলো লাউড স্পীকার থেকে।

দেয়াল থেকে একটা ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন মেজর। কয়েক সেকেন্ড ওপ্রান্তের কথা শুনে রেখে দিলেন রিসিভার। রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন।'

'রাডার?'

'হ্যাঁ। কবীর চৌধুরীর ইন্সটলেশনের দিক থেকে তিনটে হেলিকপ্টার আসছে এদিকে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আমি তা হলে রওনা হয়ে গেলাম। যতো শীঘ্রি পারেন একটা প্লেন আকাশে ওঠান। ঘুরে ফিরে আসুক। তাতে হঠাৎ হাজির হওয়া লোকগুলোর মনে হতে পারে আমি ওটাতে করে সরে গেছি।'

'যান তা হলে, সার,' আরেকটা নাম্বার ডায়াল করলেন মেজর।

'গুডলাক,' বলে বেরিয়ে এলো রানা। স্নো-ট্র্যাকে উঠে এগোল বেসের তুষার পরিষ্কার করা পথ ধরে।

দিনের আলো মাত্র ফুটতে শুরু করেছে। বছরের এসময়ে কয়েক ঘণ্টার বেশি আলোটা থাকবে না। তাতে বরং সুবিধে। যতোটা সম্ভব গোপনীয়তা দরকার এখন রানার।

কবীর চৌধুরীর লোকরা যেইমাত্র টের পাবে ও মালয়েশিয়ান বেসে নেই, তারা ভেবে নেবে হয় ও নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে প্লেনে উঠেছে, নয়তো রিসার্চ ইন্সটলেশনে ফিরে যাচ্ছে। কো-পাইলটের কথাটা মনে পড়ল ওর, স্নো-ট্র্যাকগুলোর কয়েকটা চলে গেছে কোথায় যেন। কোথায়?

মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, ওকে লোকগুলো খুঁজতে শুরু করবার আগে যেন অন্তত দু'তিন ঘণ্টা এগিয়ে থাকতে পারে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পিছনে পড়ে গেল বেসের বাড়িগুলো, টপ স্পীডে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা ধরে ছুটল রানার স্নো-ট্র্যাক। কোথাও কোথাও তুষার আবার জমে গেছে। সেসব জায়গায় লাফ দিচ্ছে মেশিন, কাত হচ্ছে এদিক ওদিক। ক্রমেই উঁচু হয়েছে সামনের বরফে ঢাকা জমি।

বেসের কাছে কপ্টারগুলো চলে আসবার আগেই ওকে পেরিয়ে যেতে হবে দূরের ওই বরফে মোড়া প্রথম সারির টিলাগুলো। তা হলে কারও চোখে ধরা না পড়ে ইন্সটলেশনে পৌঁছবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে অনেক—অবশ্য যদি যাত্রাপথে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

বারো

প্রথম টিলাটা বেস থেকে দু'মাইল দূরে। ওটার উপরে উঠে থামল রানা, স্নো-ট্র্যাক থেকে নেমে চুড়োর উপরে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে দেখা যাচ্ছে পুরো বেসটা।

ওকে নিয়ে যে সি-১৩০ হারকিউলিস প্লেনটা এসেছিল সেটা এখন রানওয়ের শেষ মাথায়, উড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওটার বিশাল প্রপেলারগুলো পেঁজা তুলোর মতো তুষার ওড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে ঘুরল ওটা, রানওয়ের মাঝখানে চলে এলো, তারপর শুরু করল দৌড়। দূরে দেখা গেল কবীর চৌধুরীর প্রথম ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টারের আলো।

দুটো হেলিকপ্টার সরাসরি ছুটন্ত হারকিউলিসের যাত্রাপথের সামনে চলে আসছে। ভয়ঙ্কর কয়েকটা মুহূর্ত রানার মনে হলো তিনটে আকাশযানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হবে। তারপর সরে গেল কপ্টার দুটো, হারকিউলিস রাজকীয় ভঙ্গিতে উঠল আকাশে, একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ করে ছুটে চলল ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ভিতর দিয়ে। একটু পরেই চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে নামল কবীর চৌধুরীর কপ্টার দুটো। আরেকটা নামল রানওয়েতে। ওগুলো থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল ত্রিশ-চল্লিশজন লোক। দূর থেকে তাদের হাতে অস্ত্র আছে কি না দেখতে পেল না রানা। তবে নিশ্চয়ই আছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। মালয়েশিয়ান আর্মি কবীর চৌধুরীর লোকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। কোন গোলাগুলি হলো না। শত্রুপক্ষে লোক অনেক বেশি। রানা আন্দাজ করল, মেজর সাফায়েত এখন নানান ধরনের প্রতিবাদ করে যতোটা বেশি সম্ভব সময় পাইয়ে দিতে চাইছেন ওকে।

আবার রওনা হলো রানা, খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। রেডিও-ডিরেকশন ফাইন্ডার ওকে পথ দেখাচ্ছে। মেইন বেস আর রিসার্চ ইন্সটলেশনের দুটো ডিভাইস সক্রিয় আছে এখনও।

প্রথমে সামনের অঞ্চলটা ছোট ছোট টিলার কারণে ধীরে ধীরে উপরে উঠল, তারপর দেখা দিল সমতল বরফের বিরান একটা সাদা মহাবিস্তৃতি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রিভ্যাস ডিটেক্টর টিটটিট করে সতর্ক করতে শুরু করল।

থামল রানা, মেজরের দেওয়া ম্যাপটা কোলের উপরে বিছিয়ে মনোনিবেশ করল। রিসার্চ ইন্সটলেশনে যাওয়ার পথটা চিহ্নিত করা আছে, সেই সঙ্গে বিশেষ ভাবে লাল কালিতে দাগ দেওয়া আছে দুটো ক্রিভ্যাসের বিপজ্জনক অঞ্চল। সঙ্গে আরডিএফ বেয়ারিংও দেওয়া রয়েছে ব্র্যাকেটে।

ম্যাপটা পাশের সিটে নামিয়ে রেখে নতুন কোর্স ধরে রওনা হলো ও, পরবর্তী কয়েক মাইল শামুকের গতিতে এগোল। বরফের মাঝ দিয়ে সুদূরে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা গভীর খাদে ভরা এলাকাটা আধঘণ্টা পর পিছনে পড়ে গেল। আবার সরাসরি পথে ফিরল রানা, গতি বাড়াল স্নো-ট্র্যাকের।

সংক্ষিপ্ত দিনের আলো বিলাবার জন্য দিগন্তে উঁকি দেওয়া লালচে সূর্যটা মাত্র তার লজ্জিত মুখ দেখিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটাকে ঢেকে দিল অগ্রসরমান ঝড়ের ঘন কালো মেঘ। ছায়াময় হয়ে গেল চারপাশ।

আরডিএফ বেয়ারিং নেওয়ার জন্য এখন ঘন ঘন থামতে

হচ্ছে রানাকে। পরবর্তী ক্রিভ্যাসের এলাকার কাছে পৌঁছুনোর আগে নিশ্চিত হতে হবে সঠিক ট্র্যাকে আছে ও, নইলে আগে থেকে ঠিক করা পথে এলাকাটা পার হতে পারবে না।

একবার ওর মনে হলো বামদিকের আকাশে বেশ দূরে প্লেনের আলো দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্নো-ট্র্যাক থামাল ও, হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

আলোটা যদি কোন এয়ারক্র্যাফটের হয়ে থাকে তা হলে ক্রুরা ওকে দেখতে পায়নি, কারণ আর ফিরে এলো না আলো।

পুরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে আবার হেডলাইট জ্বেলে সামনে বাড়ল রানা। আকাশে আরও ঘন হয়েছে মেঘের সারি, একটা নক্ষত্রও আর দেখা যাচ্ছে না। আবার বাড়তে শুরু করেছে বাতাসের বেগ।

মাঝরাতের পর ক্রিভ্যাসের ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিতীয় এলাকাটা পিছনে ফেলতে পারল রানা। রিসার্চ ইন্সটলেশন আর বড়জোর দশ মাইল দূরে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে রানার, চোখের কোণ জ্বলছে। পেশিগুলো আড়ষ্ট হয়েছে গেছে, ব্যথায় ঝিমঝিম করছে মাথা। মনে হচ্ছে গত একটা বছর ঘুমানোর সুযোগ হয়নি ওর। কিন্তু এখন থেমে বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। আগে জানতে হবে রিসার্চ ইন্সটলেশনে সব ঠিক আছে কি না।

এক পর্যায়ে ভাবল রেডিওতে যোগাযোগ করে বেস ক্যাম্পের সঙ্গে কথা বলবে কি না। ইচ্ছেটা গলা টিপে মারল। কবীর চৌধুরীর লোকজন এখনও ওখানে থেকে থাকলে ওর কাছে হাজির হয়ে যেতে এক ঘণ্টাও সময় নেবে না। অসহায় অবস্থায় আক্রমণের শিকার হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

শেষ টিলা টপকে ঢাল বেয়ে নেমে জেনারেটর বিল্ডিঙের পিছনে হাজির হলো ও, ভাঙা রেডিও টাওয়ার পাশ কাটিয়ে

এগোল। ওখানে এখনও পড়ে আছে কর্নেল তিব্বত মাহমুদের মৃতদেহ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে স্নো-ট্র্যাক থামাল রানা।

একটা জানালাতেও আলো দেখা গেল না। প্রথমে ব্যাপারটা গুরুত্ব দিল না রানা, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।

ইঞ্জিন বন্ধ করে পোর্টেবল রেডিওটা নিয়ে বেরিয়ে এলো ও, গভীর তুষারের ভিতর দিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল।

হাড়ে কামড় বসানো একটানা বাতাস বইছে এখন। তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্যের পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে। তবে ঝড়ের প্রধান চোট আসতে এখনও অন্তত বারো-চোদ্দো ঘণ্টা দেরি। ঝড় যখন আসবে তখন বাইরের সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে ঘরের ভিতরে বসে থাকতে হবে সবাইকে। কবীর চৌধুরীর লোকদেরও তখন কিছু করবার থাকবে না। সে-সময়টা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবে ও।

দরজা খুলে ডে রুমে ঢুকল রানা। ঘরটা অন্ধকার। শীতল। প্রায় বাইরের মতোই। কিছুক্ষণ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে বাতাসের আওয়াজ শুনল ও। ইন্সটলেশন জনশূন্য বলে মনে হচ্ছে। রেডিওটা আস্তে করে মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওয়ালথার বের করল রানা, নিঃশব্দে হাতড়ে হাতড়ে বাতির সুইচ খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালতে চাইল। কিছুই ঘটল না। ঘর আগের মতোই অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি নেই।

'কালাহান!' ডাক দিয়ে নিঃশব্দে কয়েক পা ডানে সরে গেল রানা।

জবাব দিল না কেউ। কিছু ঘটছে না।

'রাবিতা!' ডাক দিল রানা। 'ডক্টর হিতৈষী! ডক্টর ব্রিয়াঁ!'

বাইরে থেকে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে, এ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

বাইরে বেরিয়ে স্নো-ট্র্যাক থেকে বড় একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে

ফিরল রানা। আলো জ্বেলে দেখল দরজার কাছে অনেকগুলো বুটজুতোর ছাপ। কয়েক গজ দূরে তুষারে গভীর ভাবে ফুটে আছে কয়েকটা স্নো-ট্র্যাক মেশিনের চিহ্ন। দাগগুলো পশ্চিমে চলে গেছে। অমঙ্গলের আগাম দিচ্ছে মন।

কবীর চৌধুরীর লোকজন অথবা আমেরিকানরা এখানে এসেছিল। সম্ভবত কালাহান সিগনাল পাঠিয়ে দলটাকে ডেকে আনে। ইন্সটলেশন দখল করে ভিতরে ঢোকে। এখন কেউ নেই এখানে। দরজার দিকে ফিরল রানা। হয় সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে, নয়তো মেরে ফেলা হয়েছে। আমেরিকানরা? কেন?

বিরক্ত বোধ করল রানা নিজের উপর। ও এখানে উপস্থিত থাকলে এমনটা ঘটতে পারত না হয়তো। অথবা ও যদি কালাহানকে সঙ্গে নিয়ে যেত তা হলেও কয়েক ঘণ্টা আগেই ওদের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে যেত, নিরীহ বিজ্ঞানী আর ডাক্তারদের বিপদে পড়তে হতো না।

কবীর চৌধুরীর সাবমারসিবল আসতে আর ছত্রিশ ঘণ্টাও বাকি নেই। তার আগেই করতে হবে যা করবার। কিন্তু সেটা কী?

মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল রানা। যা-যা করতে হবে সেসব এক-এক করে করবার চেষ্টা করাই ভাল। ক্লান্ত দেহ-মনে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে তা না হলে।

জেনারেটর বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াল ও, মনকে প্রবোধ দিচ্ছে: হাতে সময় আছে, হাতে সময় আছে এখনও।

বিশ মিনিট পর অন্ধকার জেনারেটর বিল্ডিঙে ঢুকে রানা বুঝতে পারল যারা এসেছিল তারা যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি করেনি, শুধু জেনারেটরের সুইচ বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

প্রায় জমে গেছে ব্যাটারিগুলো। বিরাট ডিজেল ইঞ্জিনটা চালু হতে গড়িমসি করল। সুইচ টিপে ধরে রাখল রানা, ব্যাটারিগুলো ফ্যানটাকে জোর করে ঘোরাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বার কয়েক কেশে

স্টার্ট নিল ডিজেল ইঞ্জিন, গুঙিয়ে উঠে বন্ধ হয়ে যেতে চাইল. তারপর চলতে শুরু করল একটানা গর্জন ছেড়ে।

দ্রুত পায়ে স্নো-ট্র্যাক পাশ কাটিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। বাতির সুইচ কাজ করল এবার।

'রাবিতা!' আবার ডাকল রানা।

হিটারের ফ্যানটা মাত্র চালু হলো। দরজার পাশের গ্রিল দিয়ে ধেয়ে আসা গরম বাতাসটা অনুভব করল রানা। পার্কার হুড খুলল ও, মাইক্রোবায়োলজিস্টের লাশটা টপকে ধীর পায়ে করিডর ধরে এগোল। ডাইনিং হলের দরজার সামনে অন্তত একশোটা গুলির খোসা পড়ে আছে। উবু হয়ে একটা তুলল ও। ·৩০ ক্যালিবারের বুলেট। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।

খোসাটা ফেলে দিয়ে বাঁক ঘুরে দরজার কাছে চলে এলো ও, ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। চারদেয়াল আর ছাদে বুলেটের অসংখ্য ফুটো। ঘরের মাঝখানে লম্বাকৃতি একটা টেবিল কাত হয়ে পড়ে আছে। উপরের দিকটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। ঘরের ভিতরে কিচেনের দরজার কাছে কফির লোভনীয় কড়া গন্ধ পেল। উল্টানো টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

ডক্টর হিতৈষী চক্রবর্তী, বাঙালী-ভারতীয় জেনেটিসিস্ট, পড়ে আছেন টেবিলের পিছনে। মাথার উপরের অর্ধেকটা বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে তাঁর। হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। নিমেষে মারা গেছেন মহৎ লোকটা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা গম্ভীর চেহারায়, ওর পায়ের নীচে মুড়মুড় করে গুঁড়ো হলো ভাঙা বাসনের টুকরো।

কালাহান এবং তার সঙ্গের লোকরা এই কাজ করেছে। কিন্তু কেন? সত্যিকার কোন কারণ তো ছিল না নিরীহ মানুষগুলোকে এভাবে খুন করবার! কবীর চৌধুরীর লোকরা চায় যাতে কোন বাধা ছাড়াই সাবমারসিবলে আরভিবি-এ ভাইরাস তুলতে পারে।

এখানে কারও রেডিও ব্যবহারের উপায় ছিল না। কোনরকমের বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগই ছিল না কারও। তা হলে? কেন এই অকারণ হত্যাযজ্ঞ?

কিচেনে কেউ নেই। রেডিও রুম আর অফিসগুলোও খালি। তবে প্রত্যেকটা অফিস-ঘরে দক্ষ হাতে তল্লাশীর সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেল ও।

এবার লিভিং কোয়ার্টার খুঁজতে শুরু করল রানা। প্রথমেই বিস্ময়। ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিউবার্ট ফ্রেডারিক জনসন পড়ে আছেন জানালার কাছে, তাঁকে যখন গুলি করা হয় তখন জানালা খুলতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় বিস্ময়–ভয়ানক চমকটা পেল ও হাউজিং উইঙের শেষ মাথায়। কপালে বুলেটের ফুটো নিয়ে পড়ে আছে মার্কিন এজেন্ট কালাহানের লাশ। করিডরের মুখের কাছে পড়ে আছেন ডক্টর ফ্রাঁসোয়া ব্রিয়াঁ। তাঁকে কাছ থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে। চারপাশের মেঝেতে লেগে আছে জমাট রক্ত। তাঁর ডানহাতে একটা ·৪৫ অটোমেটিক।

ঘরটা পার হয়ে লাশের হাত থেকে অস্ত্রটা খসিয়ে নিল রানা, পরীক্ষা করে দেখল, ওটা দিয়ে একটা গুলি করা হয়েছে। এরপর কোন সুযোগই পাননি ভদ্রলোক। কালাহানের দেহটা সার্চ করল রানা। বুক পকেটে একটা কোঁচকানো কাগজ দেখতে পেয়ে ওটা ভাঁজ খুলে পড়ল। সুইস ব্যাঙ্কের একটা ক্রসড্ চেক। এক মিলিয়ন ডলার। কালাহানের নামে। সইটা কবীর চৌধুরীর। চেকটা পকেটে রেখে দিল রানা।

দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। লাশটা করিডরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

রিসার্চ ইন্সটলেশনটা দখল করেছিল আক্রমণকারীরা। কবীর চৌধুরীর লোক? কিন্তু নিজেদের একজনকে খুন করবে কেন? কবীর চৌধুরীর কাণ্ডকারখানায় বাধা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য

কমিশনটা যতো বিপজ্জনকই হোক, নিজের লোককে অপ্রয়োজনে খুন করাবে সে? ব্রিটিশ মাইক্রো-বায়োলজিস্টও কালাহানের মতো একই খাঁচার পাখি–কালাহানকে সব ভাবে সাহায্য করছিল, হয়তো সে-ও কবীর চৌধুরীরই বেতনভোগী। তাকেই বা হত্যা করা হলো কেন?

পরবর্তী দেড় ঘণ্টা একটা একটা করে প্রতিটা ঘর সার্চ করল রানা, ইন্সটলেশনের অন্যান্য বাড়িগুলোও বাদ দিল না। প্যাথোলজি ল্যাবে ডক্টর র‍্যাচেল, কপ্টার পাইলট, কপ্টার ক্রু এবং সাতাশজন বিজ্ঞানী-টেকনিশিয়ানের আড়ষ্ট বিকৃত লাশ পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাবিতা, ডক্টর সুং চ্যান আর রাশান ডক্টর স্তভিচ মিলোশোভিচের লাশ নেই ওখানে।

ডাইনিং হলে এসে আবার একটা শেল কেসিং তুলে দেখল রানা। এটাও ·৩০ ক্যালিবার। আমেরিকানরা এই ক্যালিবারের অস্ত্র ব্যবহার করে না। হয় কবীর চৌধুরীর লোকরা ইদানীং এই ক্যালিবার ব্যবহার করতে শুরু করেছে, অথবা রাশানরা। তারা ·৩০ ক্যালিবারই ব্যবহার করে।

বাইরে বেরিয়ে এসে আবার জেনারেটর বিল্ডিঙে ঢুকল রানা। বারবার তুষারের ভিতর দিয়ে কষ্ট করে যাতায়াত করছে, কিন্তু স্নো-ট্র্যাক ব্যবহার করছে না। ওটাতে যতোটা বেশি ফুয়েল থাকে ততোই ভাল। এরই মধ্যে ওর দেখা হয়ে গেছে, জেনারেটর বিল্ডিঙের ফুয়েলের ড্রাম প্রায় খালি। নতুন সাপ্লাই আসেনি, কাজেই ওটা খালি হয়ে আসবারই কথা।

আগেরবার জেনারেটর চালু করতে এসে কর্নেল মাহমুদের দেখানো ল্যাবোরেটরির গোপন দরজাটার দিকে মনোযোগ দেয়নি ও, এবার প্রথমেই ওটার কাছে গেল। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কেবিনেটের দুটো পাল্লা। ভিতরে ঢুকল রানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে। সামনের দরজাটাও খোলা। অথচ ওরা যখন বেরিয়ে আসে তখন দরজাটা বন্ধ করে তালা আটকে দিয়েছিলেন কর্নেল।

আক্রমণকারী লোকগুলো নীচে নেমেছিল। কারা? কেন?

সাক্ষী থাকতে বাধ্য। রাবিতা, সুং চ্যান আর স্তভিচ মিলোশোভিচ বন্দি, না কি পালিয়েছেন? পরে অনুসরণ করে খুন করা হয়েছে তাঁদের? তা যদি না হয় তা হলে তাঁরা এখন কোথায়?

উপরে উঠে এলো রানা, কেবিনেটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্নো-ট্র্যাকের কাছে চলে এলো, অ্যাডমিন ভবনের ডে রুমে ঢুকে মেজর সাফায়েতের দেওয়া ম্যাপটা একটা টেবিলে ছড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

রাবিতারা ইন্সটলেশনে নেই। অন্তত ও খুঁজে পায়নি। গ্যারাজ থেকে স্নো-ট্র্যাকও কমেনি। যদি ওরা সরে গিয়ে থাকে, তা হলে গেছে পায়ে হেঁটে।

ইন্সটলেশনের আশেপাশের এলাকায় চোখ বুলাল রানা।

চারমাইল দূরে, অনাহূত আগন্তুকরা যেদিকে চলে গেছে তার উল্টোদিকে ছোট একটা ক্রস দাগ দেখল ও ম্যাপে। একটা ওয়েদার স্টেশনের চিহ্ন। দক্ষিণেও একই দূরত্বে আরেকটা ওয়েদার স্টেশনের ক্রস চিহ্ন দেখা গেল।

দুটো ওয়েদার স্টেশন। সম্ভবত ওদুটোয় কেউ থাকে না, মাঝে-মধ্যে যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না দেখতে মালয়েশিয়ান কর্তৃপক্ষ লোক পাঠায়। কিন্তু ওসব জায়গায় পাঠানো মেইনটেন্যান্স ক্রুদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু ওদুটোর কথা কি উধাও হওয়া রাবিতা বা অন্যান্যরা জানে? যদি জেনেও থাকে, বিরূপ আবহাওয়ায় চার মাইল পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে পেরেছে?

যেখানে কালাহানের দেহ পেয়েছিল তার পিছনের দরজাটা খুলল ও, বাইরে বেরিয়ে এসে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। তুষারে এখানে পদচিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেল। পুব দিকে গেছে পায়ের ছাপ।

ঘাড় ফিরিয়ে করিডরের ভিতরে তাকাল রানা। ডে রুমে

লড়াই শুরু হয়েছিল, ইন্সটলেশনের সবাই সাধ্যমতো পিছিয়ে আসে এদিকে।

রাবিতা, সুং চ্যান আর স্তভিচ মিলোশোভিচ সম্ভবত এদিক দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যায়। কালাহান মনে করেনি তাকেও মরতে হবে, সে রাবিতাদের পিছনে আসে। এ-পর্যন্ত আসবার পরেই ডক্টর ব্রিয়াঁ তার নাগাল পেয়ে যান, গুলি করেন কপালে। কপালের গর্তটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় .৪৫ ক্যালিবার। ব্রিয়াঁর গুলিতেই মারা গেছে কালাহান।...কিন্তু কেন তাকে গুলি করলেন ডক্টর ব্রিয়াঁ? ধরে নিতে হয় কালাহান তা হলে আক্রমণকারীদের সঙ্গে ছিল!

ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল রানা, করিডর ধরে হেঁটে এসে সদর দরাজা খুলে আবার স্নো-ট্র্যাকে উঠে ইঞ্জিন চালু করল। হাউজিং উইঙের সামনে দিয়ে পিছনে চলে এলো ও, হেডলাইটের জোড়া হলদে আলোয় পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ধীর গতিতে এগোল, পুব দিকে চলেছে।

তুষারে ঢাকা একটা ঢাল বেয়ে উঠেছে পায়ের চিহ্ন, ওখানে থেমে নামল রানা। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছে এখানে পলাতকরা, পায়ের দাগ গভীর, এখান থেকে দেখেছে ইন্সটলেশনে কী ঘটছে, তারপর যখন বুঝেছে আক্রমণকারীরা কাউকে জীবিত ছাড়বে না তখন রওনা হয়ে গেছে আবার।

স্নো-ট্র্যাকে উঠে আবার পুবে এগোল রানা। পরবর্তী দু'মাইলে বেশ কয়েকবার বিশ্রাম নিতে থেমেছে মানুষগুলো, এক জায়গায় গভীর একটা চওড়া দাগ আর ফেরত আসা পায়ের চিহ্ন দেখে ও বুঝতে পারল এখানে পড়ে গিয়েছিল কেউ, পরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরও এক মাইল পর বরফে ছাওয়া জমি উঁচু হতে শুরু করল। কয়েকশো গজ যাওয়ার পর গম্বুজের মতো বাড়িটা চোখে পড়ল রানার, ওটার ছাদে একটা রাডার ইউনিট ঘুরছে।

ইঞ্জিনের গতি বাড়াল রানা, ধীরে ঢাল বেয়ে গুঞ্জন তুলে উঠতে শুরু করল স্নো-ট্র্যাক। রানা আগেই খেয়াল করেছে তিনটে পায়ের ছাপ ঘরটার দিকেই এগিয়ে গেছে।

ঢালের মাথায় উঠে থামল ও, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। নামবার জন্য দরজা খুলবে এমন সময়ে উইন্ডশিল্ডের কয়েক ইঞ্চি উপরে লেগে পিছলে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

ডানদিকে যাত্রীর আসনে ছিটকে সরে গেল রানা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারের মতো ওয়েদার স্টেশন থেকে গুলি করা হলো। যেখানে একটু আগে ওর মাথা ছিল সেখানটা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল উইন্ডশিল্ড।

সাবধানে যাত্রীর দরজার হাতল মোচড় দিয়ে দরজাটা খুলল রানা, গড়িয়ে পড়ল তুষারে। আবারও গুলি করছে কেউ, স্নো-ট্র্যাকের গায়ে এসে বিঁধছে বুলেটগুলো।

'রাবিতা!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল রানা। 'আমি! মাসুদ রানা! গুলি বন্ধ করাও!'

ওর চিৎকারের পরপরই থেমে গেল গুলি।

'আমি রানা!' স্নো-ট্র্যাকের আড়াল থেকে আবারও চেঁচাল রানা।

'মাথার উপরে হাত তুলে মেশিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন,' ওয়েদার স্টেশন থেকে চিৎকার করল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

'সুং চ্যান! আপনি?'

'মাথার উপরে হাত! খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন!'

সুং চ্যান, অন্তত গলার আওয়াজ আর ইংরেজি উচ্চারণে তা-ই মনে হলো। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বুঝবার উপায় নেই আসলে সে-ই, না কি এটা কোন ফাঁদ। 'ডক্টর স্তভিচ মিলোশোভিচ আপনার সঙ্গে আছেন?' বের হয়ে আসবার আগে নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাবে স্নো-ট্র্যাকের ছাদে পিছলে ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলে

বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। এবার মহিলা কণ্ঠ শুনতে পেল রানা।

'না...না! গুলি বন্ধ করুন! রানা! আমি রাবিতা!'

'রাবিতা?'

'হ্যাঁ, আমি, রানা!'

আশ্বস্ত বোধ করল রানা। 'কী অবস্থা, রাবিতা?'

'আমি ঠিক আছি। কিন্তু অন্যদের...অন্যদের মেরে ফেলেছে...আমি...আমরা...'

'আমি বেরিয়ে আসছি,' জানাল রানা। 'গুলি করতে মানা করো।'

'মাথার উপরে হাত!' আবার চেঁচিয়ে উঠল উৎকণ্ঠিত পুরুষ কণ্ঠ।

মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়াল রানা, তারপর মেশিনের সামনের দিক ঘুরে বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়। কয়েক সেকেন্ড নীরবে পার হয়ে গেল, মনে হলো অনন্তকাল, তারপর গম্বুজের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এলো একটা ছায়া মূর্তি, কাছে আসতে রাবিতাকে চেনা গেল।

'সত্যি তুমি, রানা,' লজ্জা ভুলে রানাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরল রাবিতা।

রাইফেল হাতে ডানদিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর সুং চ্যান, বামদিক থেকে আলো জ্বেলে এগিয়ে আসছেন ডক্টর স্তভিচ মিলোশোভিচ।

রাবিতার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলো রানা, রিসার্চ ইন্সটলেশনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কী ঘটেছিল ওখানে?'

'আপনিই বলুন,' মিলোশোভিচের গলায় ঝাঁঝ। 'আপনারই ভাল জানবার কথা, কর্নেল!'

'মারা গেছে সবাই,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন সুং চ্যান। 'ওদের আসতে দেখেছি আমরা। ঢুকতে দেখেছি। তারপর জেনারেটর বন্ধ করে দেয়। নিয়ম

কাজ করা দেখে মনে হয় রেগুলার আর্মি। কারা ওরা, কর্নেল রানা?'

'রাশান হতে পারে না,' বলল রানা। 'এই আবহাওয়ায় নিজেদের ইন্সটলেশন থেকে আটশো মাইল দূরে এখানে এসে রাশানরা হামলা করবে এটা বললে পাগলেও বিশ্বাস করবে না।' মুহূর্তের জন্য থামল ও, তারপর বলল, 'আমার বিশ্বাস কাজটা কবীর চৌধুরীর।' সংক্ষেপে পাগল বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে একটা ধারণা দিল রানা, বলল কালাহান তার পোষা কুকুর ছিল। 'কাজটা আমেরিকানদেরও হতে পারে না। মালয়েশিয়ান আর্মি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। বুঝতে পারছি কবীর চৌধুরী চায়নি বাইরের কেউ জানুক ভাইরাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে। তদন্ত হলে তার দিকে আঙুল নির্দেশ করত সবাই। ঝুঁকি নেয়নি।'

হতভম্ব হয়ে চোখ বড় বড় করে রানার দিকে চেয়ে আছেন সুং চ্যান আর স্তভিচ মিলোশোভিচ। রাবিতা ভ্রূ কুঁচকে ফেলেছে।

ব্যাপারটার সঙ্গে মালয়েশিয়ার সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে রানা, তথ্য দেওয়া শেষে গম্বুজ দেখাল ও। 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শীতে না জমে ভেতরে চলুন। আরও অনেক কথা বলার আছে। যদিও সুসংবাদ নেই একটাও।'

রানার মুখের দিকে একবার তাকালেন ডক্টর চ্যান, নিচু গলায় বললেন, 'চলুন।'

পা বাড়িয়ে কাজের কথা পাড়ল রানা, 'ভেতরে খাবার পাওয়া যাবে?'

'প্রচুর,' জানাল রাবিতা।

মাত্র তিনটে ঘর নিয়ে আবহাওয়া অফিস। একটায় হিটারের ব্যবস্থা নেই। ওটাতেই আছে ওয়েদার রাডার অ্যান্টেনা আর ইলেক্ট্রনিক ওয়েদার মনিটরিং ইকুইপমেন্ট। অন্য দুটো ঘর ইমার্জেন্সি লিভিং কোয়ার্টার হিসাবে রাখা হয়েছে, মেইন্টেন্যান্স ক্রুরা ঝড়ের ভিতর আটকা পড়ে গেলে যাতে নিরাপদে থেকে

যেতে পারে।

ভিতরে ঢুকে পার্কা আর ভারী মিটেন খুলে রাখল রানা, রাইফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল, হাতের নাগালে। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকাল দু'জনের দিকে। তারা টেবিলে ওর উল্টোদিকে পাশাপাশি বসেছে। কফি নিয়ে এলো রাবিতা তিন মিনিট পেরোনোর আগে। রানার অনুরোধে আবার চলে গেল গরম সুপ তৈরি করতে।

রানার প্রশ্নের জবাবে মুখ খুললেন মিলোশোভিচ, 'এসেই গুলি করতে শুরু করে তারা, কোনও দেশের সভ্য আর্মির পক্ষে যা অসম্ভব একটা কাজ। নিজে আপনি আর্মির লোক, কাজেই ভাল করেই জানেন, মিলিটারিরা যোদ্ধা হতে পারে, কিন্তু তারা ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয়। তাদের সঙ্গেই ছিল কালাহান, গুলি করছিল সে-ও। ব্রিয়াঁর গুলিতে মারা পড়ে। আর দেরি করিনি, তখনই মিস রাবিতাকে সঙ্গে করে পালাতে শুরু করি আমি। পরে মিস্টার চ্যান যোগ দেন বাইরে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না,' ঘরের কোনা থেকে বলল রাবিতা। 'ঢুকেই কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে লোকগুলো। কালাহানও! অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ছাড়া একে আর কী বলা যায়!'

অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল রাবিতা। 'গত বছর জেনেটিক সায়েন্স সম্মেলনে এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল।' রানার সামনে সুপের বাটি নামিয়ে রাখল। 'আমেরিকানরাই সবচেয়ে আগে এধরনের রিসার্চের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। চোরের মা'র বড় গলা। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পাওয়ায় আমরা জানি যে তারাই বায়োলজিকাল উইপন তৈরি করছে।'

মিলোশোভিচের চেহারায় লজ্জার কালো মেঘ ঘনাল। খুকখুক করে কাশলেন তিনি, বললেন, 'সবক'টা সুপারপাওয়ারই

বায়োলজিকাল উইপন ডেভেলপ করছে, এতে খরচ অনেক কম অথচ এর ধ্বংস-ক্ষমতা অনেক বেশি।'

'প্রকারান্তরে আপনি স্বীকার করে নিলেন যে রাশিয়াও বায়োলজিকাল অস্ত্র তৈরি করছে,' খোঁচা দিলেন সুং চ্যান।

'আপনাদের কাণ্ডকারখানার রিপোর্টও আমাদের কাছে আছে, ডক্টর চ্যান,' পাল্টা বললেন মিলোশোভিচ। 'আপনারাও দুধে ধোয়া তুলসি পাতা নন।'

পরস্পরের দিকে চোখ গরম করে চেয়ে থাকলেন দুই দেশের দুই বিজ্ঞানী।

'ওসব বাদ দিন,' মাঝখান থেকে বাধা দিল রানা। 'কাজে নামতে হলে আমার কিছু তথ্য দরকার।'

'বলুন,' তর্ক এড়াতে আগে তৎপর হলেন সুং চ্যান।

'একটা ভাইরাস এই আবহাওয়ায় কতোদূরে ছড়াতে পারে?'

জবাবটা দিল রাবিতা। 'নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়, রানা। মোটামুটি ভাবে আন্দাজ করে কিছু বলতে গেলেও জিনিসটার নমুনা দরকার হবে।'

'তবু একটা আন্দাজ?'

সুং চ্যান মুখ খুললেন। 'যে-কোন শক্তিশালী ভাইরাস এই আবহাওয়ায় দশ থেকে পনেরো মাইল ছড়িয়ে পড়তে পারবে, তারপর মৃত্যু হবে এজেন্টটার, যদি এর মধ্যে কেউ যুগান্তকারী কোন বিধ্বংসী ভাইরাস আবিষ্কার করে না থাকে, যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'পাঁচ থেকে দশ মাইল ছড়াতে পারবে বড়জোর,' মন্তব্য করলেন ডক্টর স্তভিচ মিলোশোভিচ।

'ঠিক আছে,' কফি শেষ করে সুপে চুমুক দিল রানা, 'ধরে নিলাম দশ মাইল। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের রিসার্চ ইন্সটলেশনের দশ মাইলের ভিতরে কোথাও ভাইরাসটা ছড়িয়ে যায়।...জিনিসটা কী? পাউডার? গ্যাস?'

'সম্ভবত গ্যাসীয়,' সুং চ্যানের তেরছা দৃষ্টি উপেক্ষা করে বললেন মিলোশোভিচ।

আসল কথা পাড়ল রানা। 'গোপন সূত্রে জানা গেছে জিনিসটা আরভিবি-এ। ওটা কী ভাবে নিষ্ক্রিয় করা যায়?'

নড়েচড়ে বসলেন মিলোশোভিচ। সুং চ্যানের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আমেরিকার তৈরি ফর্মুলা। একটা বায়ো-এজেন্ট। এখনও জিনিসটাকে ধ্বংস করে এমন এজেন্ট পাওয়া যায়নি। অন্তত আমরা জানি না।'

'আমরাও না,' খানিকটা লজ্জিত চেহারায় জানালেন সুং চ্যান। এখন আর রাশিয়ান বিজ্ঞানীর দিকে রোষ ভরে তাকাতে পারছেন না তিনি।

'ওটাকে ধ্বংস করা যাবে না,' খানিকটা নিজের মনেই বলল রানা। 'তা হলে যেমন করে হোক ওটাকে শত্রুপক্ষের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

'শত্রু মানে তো কবীর চৌধুরী; সে এখন কোথায়, কী করছে, কিছুই তো কারও জানা নেই,' উৎকণ্ঠা লুকাতে চেষ্টা করছে রাবিতা। রানা খেয়াল করল টেবিলে রাখা ওর হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে।

'কবীর চৌধুরী মাউন্ট স্যাবিনের কাছে একটা রিসর্টে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবে।' স্যুপের চামচ নামিয়ে রাখল রানা।

তেরো

রাইফেলের গুলিতে স্নো-ট্র্যাকের ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপগুলো গুঁড়িয়ে গেছে। ওটাতে করে রিসার্চ ইন্সটলেশনে ফেরা গেল না। চার মাইল পাড়ি দিতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। ওরা পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ঝড়। পূর্বাভাষ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের আগেই হাজির হয়ে গেছে। প্রবল বাতাস, সেই সঙ্গে উড়ন্ত তুষার। রানার ভয় লেগে উঠল, এর মধ্যে ঠিক সময়ে রঁদেভু সম্ভব হবে মালয়েশিয়ান আর্মির সঙ্গে? আসবে তো তারা?

পরবর্তী এক ঘণ্টা পরিবেশটা সহনীয় করবার কাজে ব্যয় হলো ওদের। লাশ চারটে অন্যগুলোর সঙ্গে প্যাথোলজি ল্যাবে নিয়ে রাখা হলো।

রাবিতা আর সুং চ্যান ব্যস্ততার সঙ্গে র‍্যাচেল বনেটের করা নোট পরীক্ষা করে দেখলেন আরভিবি-এর কোন অ্যান্টিডোট সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কি না জানতে। ওই সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই। হতাশ হতে হলো তাদের।

এর ফাঁকে রাশিয়ান বিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে গ্যারাজে একটা স্নো-ট্র্যাক দীর্ঘ যাত্রার জন্য তৈরি করে ফেলল রানা। ওটাতে তেল ভরবার পর তেল আর অবশিষ্ট থাকল না।

মিলোশোভিচের প্রশ্নের জবাবে ও বলল, 'আমি মালয়েশিয়ান মেইন ইন্সটলেশনে ফিরে যাব। আপনারা এখানেই থাকবেন, আবহাওয়া পরিষ্কার হবার পর কপ্টার করে আপনাদের সরিয়ে

নিয়ে যাওয়া হবে।'

'মিস রাবিতাকে সঙ্গে নেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী। 'এখানে যদি ভয়-টয় পায়...'

'সম্ভব নয়,' মানা করল রানা। 'ওখানে গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। রাবিতাকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না।'

ভ্রূ উঁচু করে রানার দিকে তাকালেন রাশিয়ান, জানতে চাইছেন কী ধরনের বিপদ। মুখ বন্ধ রাখল রানা।

'কবীর চৌধুরীর লোকদের কী হবে?' বললেন মিলোশোভিচ। 'আপনি না বললেন মালয়েশিয়ান বেসে হামলা করেছে তারা?'

'তা আমি বলিনি, আমি বলেছি ওখানে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল। না পেয়ে নিশ্চয়ই ফেরত গেছে।'

'কী করতে চাইছেন বলছেন না আপনি, কর্নেল রানা।'

'কারণ আমি নিজেও জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে,' এড়াল না রানা। 'ফুয়েল নেয়া হয়ে গেছে। চলুন, এবার বিশ্রাম নেয়া যাক। ঘুম দরকার আমার, ঘুম থেকে উঠে রওনা হতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা কাত করলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী, রানার পিছনে পা বাড়িয়ে বললেন, 'আর যা-ই করুন, মালয়েশিয়ান বেসে গিয়ে আমাদের জন্যে কপ্টার পাঠাতে ভুল করবেন না। যা জানতে এসেছি তা জানা হয়ে গেছে। আমেরিকান ভাইরাস আরভিবি-এর কারণে এখানে খুন হয়েছে সবাই। সামনের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে তথ্যটা প্রচার করব আমরা, দেখি তারা কী জবাব দেয়!'

নিজের ঘরে ঢুকে সেঁটে ঘুম দিল রানা, উঠল যখন, চারপাশ অন্ধকার, বাইরে বাতাসের কোন আওয়াজ নেই, ঝড় থেমে গেছে। বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে নিল রানা, ডে রুমে ঢুকবার আগে লিভিং কোয়ার্টারে ঢুঁ মারল। ঘড়িতে বিকেল চারটে বাজে। তার মানে পুরো দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। বড়জোর আর বিশ ঘণ্টা আছে কবীর চৌধুরীর সাবমারসিবল আসতে। তিনটে ঘরের

দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল রানা। চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে রাবিতা। ডক্টর চ্যান আর মিলোশোভিচও তাঁদের ঘরে অঘোরে অচেতন।

কাউকে বিরক্ত না করে ডে রুমে চলে এলো ও, স্যান্ডউইচ দিয়ে নাস্তা সেরে নিয়ে গরম কাপড় গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

যতো তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততোই ভাল। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। অনেক কাজ বাকি। ঠেকাতে হবে কবীর চৌধুরীকে। তা নির্ভর করে মেজর সাফায়েতের সঙ্গে ঠিক সময়ে রঁদেভু হওয়ার উপর। নইলে ওকে একা করতে হবে সাধ্যে যা কুলাবে। ব্যাপারটা হবে নাক দিয়ে পাহাড় ঠেলবার মতো। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। তিক্ত হাসল রানা, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও, আর কোন উপায় না দেখলে গুলি করে আরভিবি-এর একটা কন্টেইনার ফুটো করে দেবে। তাতে নিজেও যদি মারা পড়ে, ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ঠেকানো যাবে।

আকাশটা পরিষ্কার, এক ফোঁটা মেঘ নেই। বাতাসও থেমে আছে। অথচ কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। শূন্যের নীচে অন্তত ষাট ডিগ্রি হবে।

স্নো-ট্র্যাকটা প্রথম চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল। কুসংস্কার বলা যায়, কিন্তু রানার মনে হলো ভাগ্য ওর সাথে আছে। মাউন্ট স্যাবিনের দিকে এগিয়ে চলল ও, খুব সাবধানে; কবীর চৌধুরীর ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যাক তা চায় না। ঝড়ের কারণে নিশ্চয়ই থামতে বাধ্য হয়েছিল তারা, তারপর বেশি হলে দশ-বিশ মাইল গেছে। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা ওর জন্য অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কয়েক মিনিট পরেই পিছনে তাকিয়ে রিসার্চ ইন্সটলেশনটা আর দেখতে পেল না ও। নিজেকে বড় একা মনে হলো হঠাৎ। বাংলাদেশ, বিসিআই, সভ্যতা–ওসব যেন অন্য কোন গ্রহের

অবান্তর কথা।

জীবনে বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে রানা, কিন্তু তারপরেও সে-সবের পিছনে কোন না কোন উপযুক্ত কারণ ছিল। এখানে কেন যেন মনে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও কে, কেন এখানে এসেছে, কী করছে। সম্ভবত ধু-ধু ধবল বরফের বিস্তারই তার কারণ।

হেডলাইট না জ্বেলে এগিয়ে চলেছে রানা। আয়নার মতো স্বচ্ছ আকাশের গায়ে হাজারো নক্ষত্রের আলো পথ চলবার জন্য যথেষ্ট উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে। সে-আলোয় দূরের তুষারের ঢিবি আর বরফে মোড়া ঢালগুলো ভুতুড়ে আর অপার্থিব লাগছে দেখতে।

কিছুক্ষণ পরে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো জ্বালল ও। ওটুকু আলোতে চোখ ঝলসে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মনে হচ্ছে এক ঘণ্টার বেশি পথ চলছে ও, কিন্তু ঘড়িতে দেখল, মাত্র আধঘণ্টা পার হয়েছে।

সামনে আবছা একটা আলো দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে স্নো-ট্র্যাক দাঁড় করিয়ে ফেলল ও। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নামল রানা, কপালের উপর থেকে পার্কার হুড খুলে ফেলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ভারী ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে পেল। সেই সঙ্গে ধাতুর সঙ্গে ধাতু ঘর্ষণের কর্কশ ধাতব আওয়াজ। চিৎকার করে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কথাবার্তা চালাচালি চলছে ওখানে।

লোকগুলো কতোটা দূরে তা বলা মুশকিল। অ্যান্টার্কটিকার প্রচণ্ড শীতল আবহাওয়ায় সামান্য আওয়াজও বহু দূর থেকে শোনা যায় পরিষ্কার। তবে তারা খুব বেশি দূরে হবে না। বড়জোর আধ মাইল।

আবার স্নো-ট্র্যাকে ঢুকল রানা, পেন্সিল টর্চ আর এম২ কারবাইনটা বের করে নিল। তিরিশ রাউন্ডের একটা ক্লিপ ভরল ওটায়। পকেটগুলো ভারী হয়ে আছে কারবাইনের তাজা গুলিতে।

এবার সাবধানে পা বাড়াল আলো আর আওয়াজ লক্ষ্য করে।

কয়েক গজ গিয়েই থামছে, বুঝে নিচ্ছে ঠিক দিকে এগোচ্ছে কি না।

সিকি মাইল পরে বরফের ঢাল উঁচু হতে শুরু করল। ঢালের মাথায় উঠে ডজন খানেক বাতি দেখতে পেল ও, সেই সঙ্গে ছয়-সাতটা স্নো-ট্র্যাক। বিশ-পঁচিশজন লোক ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। গর্জন ছাড়ছে একটা পোর্টেবল জেনারেটর। উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে বরফের বুকে গভীর একটা খাদের ভিতর।

বসে বসে দেখছে রানা। কিছুক্ষণ পরে খাদের ভিতর থেকে উইঞ্চ দিয়ে টেনে কী যেন তুলতে শুরু করল লোকগুলো। ভাব দেখে মনে হলো অত্যন্ত সাবধানে কাজ করছে। বেশ কয়েকটা কন্টেইনার। ওগুলো বড় একটা স্নো-ট্র্যাকের পিছনে বাঁধা স্লেডে তোলা হচ্ছে।

কী ঘটছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না রানার। বুঝতে পারল কী করছে লোকগুলো ওখানে।

আরভিবি-এর চুরি করা ক্যানিস্টারগুলো কেউ নিয়ে যাচ্ছিল সাবমারসিবলের সঙ্গে রঁদেভু পয়েন্টের দিকে, তখন দুর্ঘটনা ঘটে। কোনভাবে ভাইরাসের কন্টেইনারগুলো ওই খাদে পড়ে যায়। একটা বা তারও বেশি ক্যানিস্টার ফেটে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ড্রাইভার। পরবর্তীতে মালয়েশিয়ান রিসার্চ ইন্সটলেশনের বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানরা দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হন।

এখন কবীর চৌধুরীর লোকরা ভাইরাসের কন্টেইনারগুলো খুঁজে পেয়েছে। কবীর চৌধুরীর সাবমারসিবল আসতে আর মাত্র আঠারো-উনিশ ঘণ্টা বাকি। সেটায় জিনিসগুলো তুলে দেবে এরা।

পিছিয়ে গেল রানা, ঢালের মাথার আড়ালে সরে এলো, তারপর ডানদিক দিয়ে ঘুরপথে এগোল আবার। আবার যখন লোকগুলোকে দেখতে পেল, তখন তারা অনেকখানি বামদিকে, কিন্তু দূরত্ব বাড়েনি। ঢাল বেয়ে কুঁজো হয়ে নামতে শুরু করল ও।

কিন্তু সেটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।

ফাটলটা কতো বড় সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না রানার, যখন পায়ের পাশে বরফ মুড়মুড় করে উঠল, তখনও বোঝেনি কী ঘটতে চলেছে। ডেবে যেতে শুরু করল বরফ, তুষার সরে গেল পায়ের তলা থেকে। ভারসাম্য হারাল রানা, বুঝতে পারল, খাদের ভিতর পড়ে যাচ্ছে ও। সচেতন ভাবে শুধু চিন্তা করতে পারল, কতো গভীর খাদ? গলা চিরে বেরিয়ে আসা চিৎকারটা কোনরকমে চেপে রাখল ও।

পড়ছে তো পড়ছেই, তারপর একটা ঝাঁকি, ব্যস, আর কিছু না।

জ্ঞান ফিরতে রানা দেখল তুষারের স্তূপের নীচে প্রায় চাপা পড়ে আছে ও। খাদের দু'পাড় দু'পাশে খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। অনেক উপরে আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল। যন্ত্রগুলোর ইঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমেই কমে আসছে! কাজ সেরে চলে যাচ্ছে কবীর চৌধুরীর লোকজন!

খাদে নামবার সহজ কোন পথ নেই। নইলে কবীর চৌধুরীর লোকরা উইঞ্চ ব্যবহার করত না। তার মানে ওরও উপরে উঠতে হলে বাইরের সাহায্য লাগবে।

তুষার সরিয়ে উঠে বসল রানা, বিধ্বস্ত স্নো-ট্র্যাকটা দেখতে পেল, কাছেই পড়ে আছে। ওটার প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে ভিতরে তাকাল ও। 'কে কে' লোগো সেলাই করা ইউনিফর্ম পরে কাত হয়ে আছে মুখ খিঁচিয়ে রাখা রক্তাক্ত লাশটা।

সিট টপকে পিছনে চলে এলো রানা, পিছনে একটা বড় প্যাকেটে খাবার, ফার্স্ট এইড কিট, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, কয়েকটা যন্ত্রপাতি আর স্নো-ট্র্যাকের পার্টস্ পেল। কোন দড়ি বা চেন নেই। পাহাড়ে উঠবার মতো কিছু এখানে নেই। ফুটো হয়ে যাওয়া কন্টেইনারটা টর্চ জ্বেলে দেখল ও বেশ কিছুক্ষণ। ভাইরাসের ক্ষমতা ভয় ধরিয়ে দিল ওর মনে। ফুটো হল এই

খানে, অথচ দশ-বারো মাইল দূরে রিসার্চ সেন্টারের একজনও বাঁচল না!

কয়েক প্যাকেট খাবার পকেটে পুরে আবার মেশিনের সামনে ফিরল রানা, আস্তে আস্তে নড়চড়া করা যেন কঠিন হয়ে আসছে। দীর্ঘক্ষণ ও চুপচাপ বসে থাকল স্নো-ট্র্যাকে, তাকিয়ে থাকল ফাটা উইন্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে খাদের খাড়া পাড়ের দিকে। মনে হলো যেখানে আছে আরামেই আছে, নড়বার কোন কারণ নেই, কিছু করবার কোন দরকারও নেই, শুধু চাই বিশ্রাম আর ঘুম···

না, ঘুমালে চলবে না, কাঁচাপাকা কুঁচকানো ভ্রূর কঠোর ভর্ৎসনা দেখতে পেল রানা। একটা কপাল। কার? এক পাশে একটা শিরা তিরতির করে লাফাচ্ছে কেন!

চোখ কচলে মেশিনটা থেকে বেরিয়ে এলো রানা, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ওখানে চুপ করে বসে থাকলে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাবে। তা হলে কেউ থাকবে কি ভাইরাসটা কবীর চৌধুরীর হাত থেকে উদ্ধার করতে? মালয়েশিয়ান আর্মি আছে···না, ওর দায়িত্ব ওকেই পালন করতে হবে। যতোক্ষণ সম্ভব।

খাদটা অন্তত পঞ্চাশ ফুট গভীর। ও যেখানে আছে সেখানে দু'পাশের দেয়ালের ফারাক পনেরো ফুটের বেশি হবে না। উপরের দিকে দু'দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকটা চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ ফুট হবে। এতো খাড়া যে খাদের পাড় বেয়ে উঠবার চেষ্টা করা পাগলামি হবে।

সামনে বাড়ল রানা, ওর বুটের নীচে কিচকিচ করে গুঁড়ো হচ্ছে তুষার। সামনে হয়তো খাদের মেঝে ঢালু হয়ে সমতলে মিশেছে কোথাও। অথবা পাড় হয়তো এতো খাড়া নয় যে বেয়ে উঠতে পারবে না। বিধ্বস্ত স্নো-ট্র্যাকের কাছ থেকে একশো ফুট সরে এসেছে রানা। উপরে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। থামল ও। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল। মনটা বলছে ভুল শোনেনি।

কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল, আর কোন আওয়াজ নেই। ঠিক তখনই ওর মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেল একটা জোরাল আলো। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল রানা। নিজেকে মনে হলো চতুর কাক, চোখ বন্ধ করে ভাবছে আর কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ওয়ালথার হাতে লাফ দিয়ে উঠেই সোজা ছুটল ভাঙা স্নো-ট্র্যাকের দিকে। এখন স্নো-ট্র্যাকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

হাড়ের ভিতরে কামড় বসাচ্ছে ঠাণ্ডা। খাদের ভিতরে নানা জায়গায় হানা দিচ্ছে সাদা আলো। কে যেন চিৎকার করে কী বলল। আলো নিভে গেল।

চলে যাচ্ছে লোকগুলো। দেখতে পায়নি ওকে!

আধঘণ্টা হেঁটে তারপর উপরে উঠবার মতো একটা জায়গা পেল রানা। এদিকে খাদের পাড় বেশ ঢালু। পিছলা বরফ বেয়ে উঠতে মিনিট দশেক লাগল। ফিরে এলো ও স্নো মোবাইলের কাছে, রওনা হলো কবীর চৌধুরীর লোকদের চিহ্ন অনুসরণ করে।

মাউন্ট স্যাবিনের কাছাকাছি মেজর সাফায়েতের সঙ্গে দেখা হলো ওর। বেশ কয়েকটা স্নো-ট্র্যাকে করে সসৈন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। আলো নিভানো স্নো-ট্র্যাকগুলো দেখে ওগুলোর কাছে থামল রানা।

কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলেন মেজর। প্রত্যেকে সশস্ত্র, অস্ত্র বাগিয়ে রেখেছে বিপদের আশঙ্কায়।

'ব্রিফ করেছেন সবাইকে?' মেজরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরাসরি কাজের কথায় এল রানা। মেজর মাথা নাড়ানোয় বলল, 'তা হলে সবাইকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলুন। আমি ব্রিফ করছি।'

নির্দেশ পালিত হলো। সহজ সরল কথায় ওদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব বর্ণনা করল রানা, বুঝিয়ে দিল, এটা এমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট যে নিজের জীবনের কোন মূল্য নেই মনে করে দেশের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সৈন্যরা বুঝেছে অনুভব করে রওনা হলো ও মেজরের

মেশিনের পিছনে। চলে যাওয়া স্নো ট্র্যাকের দাগ এখনও পরিষ্কার। সেদিকেই এগিয়ে চলল ওরা সতর্কতার সঙ্গে।

'আমরা ওদের আস্তানায় যাওয়ার পর খানিক সময় দেব,' রওনা হওয়ার আগে মেজরকে বলেছে রানা। 'কাউকে সন্দেহ করছে না ওরা। সতর্ক থাকার কথা নয়। তবু ওখানে পৌঁছে দূর থেকে অবস্থা দেখে আরেকবার সবাইকে ব্রিফ করব আমি।'

'ঠিক আছে, কর্নেল,' সায় দিয়েছেন মেজর।

ফরাসি ধাঁচের দোতলা বাড়িটা প্রকাণ্ড। বিশাল জায়গা নিয়ে। সামনে উঠান। দু'পাশে দুটো ব্যারাক, জানালাগুলোয় আলো জ্বলছে। পিছনের আকাশে মাথা উঁচু করে আছে মাউন্ট স্যাবিন। শ্যাতোটা দেখলে মনে হয় অত্যন্ত বিলাসী কোন শৌখিন ভদ্রলোক অবসর বিনোদনের জন্য তৈরি করেছেন।

বাড়ির সামনে লোহার গ্রিলের কারুকাজ করা একটা সুউচ্চ গেট। মেজর সাফায়েতের বিনোকিউলার ব্যবহার করে আড়াল থেকে ওটার ফাঁক দিয়ে দশ মিনিট দেখল রানা। দু'জন গার্ড আছে, গেটের সামনে পায়চারি করছে সাবমেশিনগান হাতে। বাড়ির ভিতরের দিকে আরও গার্ড আছে বলে মনে হলো না। থাকলেও একজনও ওর চোখে পড়েনি। থাকবার অবশ্য কথাও নয়। এই সময়ে অ্যান্টার্কটিকায় প্রহরী রাখবে কে!

দ্বিতীয়বার ব্রিফিং সারল রানা সংক্ষেপে। এবার লড়াইয়ের কৌশল কী হবে সে-ব্যাপারে কথা বলল। ব্যারাক দুটো এবং জেটিতে প্রায় একই সঙ্গে চালানো হবে আক্রমণ। জেটিতে সম্ভব হলে গোলাগুলি এড়াতে হবে। কথা শেষে জিজ্ঞেস করল ও কারও কোন প্রশ্ন আছে কি না। নেই কারও কোন প্রশ্ন।

সাফায়েত জামিলকে নিচু স্বরে কী যেন বলল রানা মিনিট দুয়েক। ওর কথা শেষ হওয়ার পরে আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, বললেন, 'ঠিক আছে, সার। গোলাগুলি হবে না। দরকার

হলে হাতাহাতি লড়াই করব। কন্টেইনারগুলো নিরাপদ রাখার জন্যে যা দরকার করতে দ্বিধা করব না আমরা।' পাঁচজন সৈন্য নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনি জেটির দিকে।

দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর বাকি সৈন্যদের আরেকবার ব্রিফ করে দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ল এবার বাড়ির ভিতর। সামনে-পিছনে দু'ভাগে আক্রমণ চালাবে অবশিষ্ট সৈন্যরা।

বিশ পা এগোনোর আগেই দেখা দিল ওগুলো। দুটো কালো ছায়া, তীরের মতো ছুটে আসছে। আকৃতিটা রানার খুব চেনা। ডোবারম্যান পিনশার। খুনী কুকুর। কামড় বসিয়ে ঝটকা মেরে শিকারের গলা ছিঁড়ে ফেলে, একবারও ডাকে না তার আগে।

প্রথমটা লাফ দিতেই হাত মুখের সামনে এনে পার্কার মোটা কাপড়ে ওটাকে কামড় বসাতে দিল রানা, পরমুহূর্তে ধাঁই করে মাথায় বসিয়ে দিল ওয়ালথারের নলের বাড়ি। গায়ের জোরে মেরেছে। মানুষের মাথা হলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। জ্ঞান হারাল কুকুরটা, ধপ করে পড়ল রানার পায়ের কাছে।

দ্বিতীয়টা সতর্ক হয়ে উঠেছে, রানাকে পাশ থেকে আক্রমণ করবার ইচ্ছেয় সরতে শুরু করল। ঘুরছে রানাও। কুকুরটার হাঁপানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। দু'মিনিট ঘুরেও রানাকে পাশ বা পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারবে না বুঝে সামনের দু'পায়ে নিচু হলো ওটা, তারপর লাফ দিল রানার কণ্ঠা লক্ষ্য করে।

বামহাতে ওটাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল রানা, ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। রানার কব্জি কামড়ে ধরেছে পিনশার, এখনই ছেড়ে দিয়ে আবার লাফ দেবে গলা লক্ষ্য করে। অন্য হাতে কুকুরটার ঘাড় জড়িয়ে ধরল রানা, টান দিয়ে কামড় খাওয়া হাতটা ছাড়িয়ে নিল। হাত থেকে পড়ে গেছে ওয়ালথার। মনে হলো যেন গরম ছ্যাঁকা দিয়েছে কেউ কব্জিতে। মাংসে বসে যাওয়া দাঁতগুলো ছুটে যেতে আবার কামড় বসানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল

কুকুরটা। সুযোগ পেল না, কাঁধ থেকে এম২ কারবাইন নামিয়ে ফেলেছে রানা, ওটাকে লাঠির মতো ধরে প্রচণ্ড জোরে ঘুরিয়ে মাথায় বাড়ি মারল ও। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কুকুরটা মাটিতে। উঠবার আগেই হাঁটু মুড়ে বসে আবার মারল রানা, আবার। জ্ঞান হারিয়েছে নিশ্চিত হয়ে ওয়ালথারটা তুলে উঠে দাঁড়াল।

তাকাল চারপাশে। নিঃশব্দে ঘটে গেছে কুকুরের আক্রমণ। প্রাসাদের দু'পাশের ব্যারাক দুটোর জানালা দিয়ে এখনও আলো আসছে। দরজা খোলা হয়নি একটারও। কেউ টের পায়নি। ভিতরে হৈ-চৈ করছে লোকজন। তাস পেটাচ্ছে কয়েকজন, কয়েকজন টিভি দেখছে বা রেডিও শুনছে। এই বিরান এলাকা বলেই বোধহয় এতো নিশ্চিন্তে আছে ওরা।

ওয়ালথার রেখে কারবাইনটা বাগিয়ে ধরে সেফটি অফ করল ও, আবার এগোল বাড়িটার দিকে। ভিতরে একটা আলোও জ্বলছে না। দেখে মনে হয় কেউ নেই। কিন্তু আছে। থাকতেই হবে। কবীর চৌধুরী হয়তো নেই, কিন্তু কেউ না কেউ থাকবে।

বাড়ির ভিতর ভাল একটা অবস্থানে অপেক্ষা করলে সময়মতো কবীর চৌধুরীকে হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। তার আগে বাগে আনতে হবে গেট ও বাড়ি পাহারায় থাকা গার্ডদের। ঘড়ি দেখল ও। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই জেটি দখল করেছেন মেজর সাফায়েত। সব ঠিক মতো চললে সবই ঘটবে নীরবে। ভাইরাসের কন্টেইনারের কাছে অনেক বেশি গার্ড রাখবে কবীর চৌধুরী? মনে হয় না।

বেল্ট থেকে গ্রেনেড খুলে নিল ও, নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল কাছের ব্যারাকটার দিকে। ঠিক তখনই বাড়ির কোনা ঘুরল একজন গার্ড। উঠানের অন্ধকার ছায়ায় রানাকে দেখেই কারবাইন তুলতে শুরু করল সে, চিৎকার করে উঠল, 'হল্ট! কে! কে ওখানে!'

জবাবটা পেল সে এম২ কারবাইনের এক পশলা গুলির

মাধ্যমে। বুকে গুলি খেয়ে ছিটকে পিছনে গিয়ে পড়ল লোকটার মৃতদেহ।

এখন আর গোপনীয়তার প্রশ্ন নেই। দৌড় দিল রানা, গেট পাশ কাটিয়ে ছুটল ডানদিকের ব্যারাকের দিকে। বেশ কয়েকটা কারবাইনের গুলির আওয়াজে বুঝতে পারল গেটে আক্রমণ করেছে প্রথম দলের মালয়েশিয়ান সৈন্যরা। এবার বাড়ির পিছন থেকেও তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এলো। দ্বিতীয় দলও কাজে নেমে পড়েছে। মেজর সাফায়েত? সুষ্ঠু ভাবে শেষ হয়েছে তো তাঁর কাজ?

ঝটাং করে একটা শব্দ হলো। গেট খুলে গেছে। ব্যারাকগুলো থেকে কবীর চৌধুরীর লোক অস্ত্র বাগিয়ে বের হতে শুরু করেছে।

পিন খুলে দরজা দিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল রানা, কানের পাশে শিস কেটে বুলেট চলে যাওয়ার শব্দে কুঁজো হয়ে পাল্টা গুলি করল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা দুই লোক ঝাঁকি খেতে খেতে পিছিয়ে গেল। ব্যারাকের ভিতর গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই উঠল আহতদের কাতরানি আর বুক ফাটা আর্তনাদ।

অন্য ব্যারাকটাতে হানা দিয়েছে কয়েকজন মালয়েশিয়ান সৈন্য। কর্নেল রানাকে এভাবে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে নামতে দেখে তাদের উৎসাহ বেড়ে গেছে বহুগুণ। পরপর কয়েকটা গ্রেনেড ফাটল। রানার পিছনে রণ-হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে আসছে আরও কয়েকজন, রানার নিরাপত্তার জন্য দু'পাশে আর সামনে কাভারিং ফায়ার করছে।

দৌড়ের উপর উঠান পেরিয়ে বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঠিক মতোই পজিশন নিয়েছে সৈন্যরা।

কাঁচের দরজাটা ভিড়ানো ছিল, রানা আস্তে করে ঠেলা দিতেই একটা পাল্লা খুলে গেল। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে এক তলা পুরোটা সাবধানী পায়ে ঘুরে দেখল ও। পাঁচ হাজার বর্গফুট, সুন্দর করে

সাজানো, যে-কোন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালার চেয়েও সুসজ্জিত।

ডাইনিং রুম থেকে উঠে গেছে উপরে যাওয়ার পুরু কার্পেটে মোড়া চওড়া ঘোরানো সিঁড়ি। দোতলার ল্যান্ডিঙে থামল ও। নীচ থেকে একই সঙ্গে দুটো ব্যারাকে গোলাগুলির শব্দ চলছে। আবার গ্রেনেড ফাটল পরপর কয়েকটা। বাড়ির পিছন দিকে কমে যাচ্ছে গুলির আওয়াজ। জেটির কাছ থেকে কোন আওয়াজ নেই। বোধহয় মেজরের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে ভাড়াটে লোকজনের লড়াই, ফলাফলটা সহজেই অনুমেয়। করিডর ধরে এগোল রানা, দ্রুত পায়ে হাঁটছে, তবে ভাব দেখে মনে হলো কোন ব্যস্ততা নেই। দু'পাশের দুটো দুটো চারটে ঘর পেরিয়ে গেল ও, তারপর ডানদিকের তৃতীয় ঘরটার দরজার তলা দিয়ে আলো দেখে কারবাইন বাগিয়ে লাথি মারল দরজায়। থরথর করে কাঁপল বন্ধ দরজা, খুলল না। আবার লাথি মারল রানা। এবার দড়াম করে খুলে গেল পাল্লা। ভিতরে ঢুকেই এক পাশে ছিটকে সরে গেল রানা। উজ্জ্বল আলোয় চোখ সইয়ে নেওয়ার ফাঁকে কারবাইন তুলল বুক-সমান উচ্চতায়।

রানাকে দেখে মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। বিরাট একটা টেবিলের পিছনে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে সে। ভাব দেখে মনে হলো বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করছে না।

'খেল খতম, কবীর চৌধুরী!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল পাগল বৈজ্ঞানিক। 'না, রানা, মাত্র তো শুরু। তা...দাঁড়িয়ে কেন, বসো!'

ঘরের ভিতরে চট করে চোখ বুলিয়ে নিল রানা, সুন্দর করে সাজানো, তবে সামনের এই বদ্ধ পাগলটা ছাড়া আর কেউ নেই। ওয়ালথারটা বের করে কারবাইন মেঝেতে ফেলে একটা চেয়ার টেনে বসল ও কবীর চৌধুরীর সামনে।

'আবার ব্যর্থ হতে হলো তোমাকে,' ওয়ালথার একচুল নাড়াল

না রানা কবীর চৌধুরীর উপর থেকে।

'না, রানা, না,' অনাবিল হাসল কবীর চৌধুরী। 'ভাইরাসগুলো এখন আমার জেটিতে সাবমারসিবলের জন্যে অপেক্ষা করছে। সাবমারসিবল এসেও যাওয়ার কথা। দাঁড়াও, দেখছি।' ওয়াকিটকির সুইচ টিপল বিজ্ঞানী। 'কী হলো, খাদেম, মাল তোলা হয়ে গেছে?'

ধাতব গলার আওয়াজ ভেসে এলো, 'জী, সার।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। সামনে বসা এই উন্মাদটা কি জানে ওর পরিকল্পনা সফল হয়ে থাকলে ওই খাদেম ব্যাটা এখন মাথায় রাইফেলের নলের গুঁতো খেয়ে মিথ্যে বলছে?

'ভাইরাস যদি উঠিয়েও ফেলে তবু তোমার কোন লাভ হবে না, কবীর চৌধুরী,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'তুমি অন্তত সাবমারসিবলে উঠতে পারছ না।'

'আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম রানা,' পাইপ ধরিয়ে টান দিল কবীর চৌধুরী। 'তুমি এখানে তা জানার পর থেকেই আশা করছি দেখা পাব।' পাইপ তাক করল সে। 'গল্প করার আর সময় নেই বেশি। ভাইরাসের কন্টেইনার তোলা হয়েও গেছে, এবার এদিকের পালা চুকিয়ে চলে যাব আমি।'

'পারবে না,' ওয়ালথার নাড়ল রানা, 'তুমি এখন বন্দি। সোজা বাংলাদেশে চালান হবে এবার।'

পাইপটা অধৈর্য ভঙ্গিতে নাড়ল কবীর চৌধুরী, রানার দিকে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'এখনও তোমার মোহ কাটল না, রানা। দেশপ্রেম। দেশপ্রেম! হাহ্! অর্থহীন উন্মাদনা। এসো, হাত মেলাও আমার সঙ্গে। একবার চিন্তা করো, বাংলাদেশে মাত্র দু'কোটি লোক আছে। জিডিপি কমেনি। কমতে দেব না আমি। কী ঘটবে তা হলে?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল পাগল বৈজ্ঞানিকের। 'সোনার বাংলা সত্যিই সোনার বাংলা হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিয়ে গেছ তুমি, তবুও, বিশ্বাস করো, মাত্র দুটো মাস

লাগবে আমার আরভিবি-এর অ্যান্টিডোট তৈরি করতে। তারপরই...'

'তুমি একটা উন্মাদ, কবীর চৌধুরী।'

পাত্তা দিল না বিজ্ঞানী। 'তারপরই ধরো ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান। ওই দুটো দেশে লোক সংখ্যা কমিয়ে আনব ছয় কোটিতে। আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা সাফ করে দেব। আমাদের উপমহাদেশের লোকরা ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে। একসময় আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন বিশ্ব শাসন-ব্যবস্থা। সুখের পৃথিবী, কি বলো?' পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে রানার মুখে। 'তোমার তো খুশি হওয়া উচিত, রানা। অনেকটা তোমার কথাতেই কিন্তু আমি বিশ্বে সাইবর্গ শাসন-ব্যবস্থার স্বপ্ন বাদ দিয়েছি। আসলেই হয়তো কাজটা ভাল হতো না। নতুন করে ভেবে দেখেছি, থাক না মানুষ তাদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে। মানুষই তো, দেবতা তারা না-ই বা হলো। আমাকে মেনে চললেই যথেষ্ট। তা হলেই পৃথিবীতে আসবে চিরশান্তি।'

ওয়ালথারের ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল রানা। 'ভাবছি তোমার মতো একটা বস্তাপচা উন্মাদকে জীবিত না নিয়ে গিয়ে মেরে রেখে যাব কি না। দুনিয়ার তাতে কোন ক্ষতি হবে না, বোধহয় উপকারই হবে!'

জবাবে চুপ করে থাকল পাগল বৈজ্ঞানিক, তারপর রানার গম্ভীর চেহারা একটা দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে দেখে বিষণ্ন ভঙ্গিতে আস্তে করে মাথাটা এক দিকে কাত করল, যেন এটা একটা ইঙ্গিত।

রানার মনে হলো ওর দুই কানে দুটো রশি পেঁচিয়ে এক মন ওজন চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। পিছনে মাথা হেলে পড়ল ওর, অনেকদিন পর মুহূর্তের জন্য চট্ করে মনে হলো, স্কুলে আছে ও, পড়া পারেনি বিজ্ঞান সারের, তিনি দুই কান ধরে ওকে শূন্যে ওঠাচ্ছেন। কিন্তু টানটা নীচের দিকে, উপরে নয়!

নিজের অজান্তেই খালি হাতটা পিছনে চলে গেল ওর, খপ করে মোটা একটা ঘাড় চেপে ধরে ফেলতে পারল ও। পরক্ষণেই কব্জিতে কামড় খেয়ে ছেড়ে দিল। ঝাঁকিতে ওয়ালথারের নলটা একটু সরে গেছে। চোখের কোণে দেখল, একটা খাটো দেহ দৌড়ে ঘরের ওদিকের একটা ডেস্কের তলায় সেঁধিয়ে গেল।

টেবিলে একটা বোতামে চাপ দিয়েছে কবীর চৌধুরী, রানা ওয়ালথার ঘুরানোর আগেই পিছনের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল। হুশ্ করে একটা শব্দ হলো, তারপর কবীর চৌধুরীর চেয়ারটা বিদ্যুদ্বেগে ঢুকে গেল ফাটলের মধ্যে। রানা ওদিকে পিস্তল তাক করবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকটা।

স্পীকারে কবীর চৌধুরীর গলা শুনতে পেল রানা।

'বিদায়, রানা, বিদায়! তোমাকে খুন করতে পারতাম, কিন্তু তা হলে এভাবে অপমান করতে পারতাম না। বারবার আমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছ তুমি। আমি ক্ষমা করেছি। আবারও ক্ষমা করলাম। ভবিষ্যতে মনে রেখো, আমি তোমাকে জীবন দান করেছি!'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয় কোন্ সুইচটা টিপলে সেটা দেখেছে ও আবছা ভাবে। ঝুঁকে টিপল। কিছুই হলো না।

সময় নষ্ট না করে বামনটা যে-ডেস্কের তলায় গিয়ে ঢুকেছে ওটার সামনে চলে এলো ও, হাঁটু মুড়ে দেখল যা ভেবেছিল তা-ই। ব্যাটা ঘাপটি মেরে বসে আছে। রানাকে দেখে ভয়ে চেহারা বিকৃত করল।

ঘাড় ধরে ওটাকে টেনে বের করল রানা। 'বল্, ব্যাটা, কবীর চৌধুরী যেদিকে গেছে সে দরজা কীভাবে খোলা যায়!'

কঁকিয়ে উঠল বামন, অস্বাভাবিক মোটা গলায় বলল, 'আমি জানি না!'

'সত্যি?'

'সত্যি।' রানার চোখে একবার তাকিয়েই চট করে চোখ বুজল বামন। 'একেবারে আমার বাবার কসম!'

'তোর বাবা? খুবই খাটো কসম তা হলে!' ঘাড়ে আঙুলের চাপ বাড়াল রানা। হাতে কামড় আর কানে মোচড়ের ব্যথাটা ওকে আরও রাগিয়ে দিয়েছে। 'কবীর চৌধুরীর জন্যে অতো দরদ কীসের তোর? তোকে তো ফেলে চলে গেছে!'

'না, রানা,' গমগম করে উঠল কবীর চৌধুরীর গলা। 'ওকে আমি নিয়ে যাব। আয়, বুলডগ!'

কবীর চৌধুরীর কথাও শেষ হলো, কামড় দিতে ওস্তাদ বামনও ডেস্কের নীচে কী যেন একটা করল। হড়াস্ করে খুলে গেল ডেস্কের উপরের অংশটা, রানার হাতের কব্জিতে আরেক কামড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে ফোকরের ভিতরে ঢুকে পড়ল বামন। দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল আগের মতো, ডেস্কটা চোখের পলকে চলে গেল ফাটলের পিছনে, বন্ধ হয়ে গেল ফাটল।

লিসেনিং ডিভাইস খুঁজতে শুরু করল রানা, হাতে মোটেই সময় নেই, কিছুক্ষণ খুঁজে কিছু না পেয়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করল নীচে। সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হলো মেজর সাফায়েতের সঙ্গে। রানাকে কোন কথা বলতে দিলেন না তিনি, বুকে জড়িয়ে ধরে পিষলেন।

'কর্নেল! আজকে আপনার কথায় এখানে না এলে সত্যিই নিজের বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যেতাম! কর্নেল রানা, দুটো ব্যারাকই দখল করে নিয়েছি আমরা, ভাইরাস এখন আমাদের দখলে। আপনার কথা মতো জেটি থেকে সরে এসেছি। কন্টেইনারগুলো সরানোও হয়ে গেছে, সার। ওদের সতেরোজন সন্ত্রাসী মারা গেছে, পাঁচজন বন্দি। আমাদের আহত হয়েছে তিনজন, নিহত এক।'

স্বস্তির শ্বাস গোপন করল রানা, 'ওগুলো নিয়ে এক্ষুণি মেইন বেসে লোক পাঠান। যতো দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে ওখান

থেকেও। নির্দেশ দিন যাতে ওগুলো পৌঁছামাত্র প্লেনে তুলে মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমি ধারণা করছি, যে-কোন সময়ে আমেরিকানরা হাজির হবে এখানে। মালয়েশিয়ান বেসেও যেতে পারে তাদের লোক।'

'আমেরিকানরা?' অবাক হলেন মেজর।

কালাহানের কাছ থেকে খবর না পেয়ে চলে আসতে পারে আমেরিকানরা। তাগাদা দিল রানা, 'ভাইরাস মালয়েশিয়ায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। ভাইরাসের কন্টেইনার ঠিক মতো মেইন বেসে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব থাকল আপনার ওপর। আমি কয়েকজনকে নিয়ে থাকছি কেউ এলে সামলানোর জন্যে।...সব ভাল যার শেষ ভাল। এখন আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'ইয়েস, কর্নেল!' সৈন্যদের ব্যস্ত হয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন মেজর।

রানা ফিরে এলো কবীর চৌধুরীর সঙ্গে শেষ যে-ঘরে দেখা হয়েছে সেখানে। ডেস্কের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হলো না এবার ওকে। কবীর চৌধুরীর টেবিলের সুইচটা দু'বার পরপর টিপতেই খুলে গেল দেরাজের মতো স্টিলের দরজাটা। ল্যান্ডিং। তারপরই একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। নামবার পর দেখল স্বল্পালোকিত একটা ঢালু করিডর। ডানে বাঁক নিয়েছে করিডর। বাঁক ঘুরতেই একটা প্ল্যাটফর্ম মতো। সেটা থেকে লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে। নীচে চিকচিক করছে প্রশান্ত মহাসাগরের কালচে পানি। হিটার দিয়ে বোধহয় জেটির আশেপাশের বরফ গলানো হয়েছে। বড়সড় জেটি, দুটো নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রাখবার মতো জায়গা আছে, তবে কোন নৌযান নেই।

একটা কার্নিস চলে গেছে জেটির ধার দিয়ে বাইরের দিকে। অন্ধকার। পা বাড়াবে কি না ভাবল রানা। কবীর চৌধুরী কোথায় গেছে? কার্নিস ধরে বাইরের দিকে?

জবাবটা পেতে দেরি হলো না ওর। জেটির বাইরের দিকে

একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। জেটি আক্রমণ করায় বোধহয় সরে গেছে। কবীর চৌধুরী জানে না ভাইরাস তোলা হয়নি ওটায়। জোরাল আলোয় প্রথমে আবছা ভাবে দেখা গেল, এক লোক বসে বসে সাঁতার কাটছে! আকৃতিটা যেন উদ্ভট! ওটা আলোর আরও কাছে যাওয়ার পরে কী ঘটছে বুঝতে পারল রানা।

সাঁতার কাটছে কবীর চৌধুরী, তার পিঠে সওয়ার হয়ে আছে বুলডগ নামের কামড়-এক্সপার্ট বামনটা! আলোটা আসছে সাবমারসিবলের কনিং টাওয়ারের সার্চলাইট থেকে।

পাগল বিজ্ঞানী পিস্তলের গুলির আওতার বাইরে। চিৎকার করল রানা, 'আবার দেখা হবে, কবীর চৌধুরী!'

কনিং টাওয়ারের মই বেয়ে ছোট আকৃতিটাকে উঠে যেতে দেখল ও। কবীর চৌধুরীও উঠছে। গলা ছেড়ে পাগলের মতো হেসে উঠল, 'পারলে না, রানা! ঠিকই ভাইরাসটা নিয়ে গেলাম আমি। এবার কাজ শুরু করে দেব। জানতেও পারবে না কখন ছোঁ দিয়ে তোমার জান নিতে নেমে আসবে মৃত্যুদূত। প্রথম ক্যানিস্টারটা তোমার বাড়ির সামনেই ফাটাব আমি।'

মনে মনে হাসল রানাও। 'আমি যেমন অনেক কথা জানি না তেমনি তুমিও একটা কথা জানো না, কবীর চৌধুরী,' গলা চড়িয়ে বলল। 'কাছাকাছি থাকার কথা আমেরিকানদের। ওদের বেস কিন্তু কাছেই। গোলাগুলির আওয়াজে চলে আসতে পারে। হয়তো রওনাও হয়ে গেছে। ওরা তোমাকে পেলে খুশিতে নাচবে।'

এবার পাগল বৈজ্ঞানিক কোন জবাব দিল না। রানার চোখের ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হলো মই বেয়ে উঠবার গতি বেড়ে গেছে তার। উপরের হ্যাচটা ধাতব শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল, ভুশ্‌শ্‌ করে ডুব দিল সাবমারসিবল।

বুক টানটান করে রানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডার জনসন কেলগ. পাকা আপেলের মতো চেহারা টকটকে লাল। রানার

দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে অবশিষ্ট কয়েকজন রয়ে যাওয়া মালয়েশিয়ান সৈনিক। প্রত্যেকের হাত তাদের অস্ত্রের উপরে। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় তিন গুণ, কিন্তু আমেরিকান সৈন্যদের দিকে পাল্টা চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে সবাই।

রানা জানে, যে-কোন এক পক্ষের অসতর্কতায় পুরোদস্তুর খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে এখানে। সেটা ও এড়াতে চায়। আমেরিকানরা এসেই উদ্ধত আচরণ করছে। কড়া সুরে রানার সঙ্গে কথা বলছে এখন কমান্ডার কেলগ।

'আপনারা এখানে কী করছেন, কর্নেল রানা?'

জবাব তৈরিই ছিল রানার। 'মালয়েশিয়ান ইন্সটলেশনে বাঙালী বিজ্ঞানী ছিলেন। আপনারা জানেন ওখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেজন্যেই তাঁদের কোন খবর না পেয়ে বাংলাদেশ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে।' সৈন্যদের দেখাল। 'আমার সঙ্গে এসেছে এরা।'

'আমরা তীরে ড্রিল করছিলাম,' সন্দেহের চোখে রানাকে দেখে বলল কমান্ডার। 'এখানে গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে চলে এসেছি। কী ঘটেছে এখানে?'

'মিস্টার কালাহান খবর দিয়েছেন নিশ্চয়ই?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি তাঁর কথা জানলেন কী করে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল কমান্ডারের।

পকেট থেকে চেকটা বের করে দেখাল রানা। 'ও কবীর চৌধুরীর কেনা গোলাম ছিল। একটা পচা আবর্জনা। আমেরিকার একটা কলঙ্ক।'

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখল কমান্ডার, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী যেন নাম বললেন আপনার? ম্যাসুড র‍্যান্যা?'

'মাসুদ রানা। বাংলাদেশ আর্মি। মেজর মাসুদ রানা। নুমার অনারারি ডিরেক্টর।'

'গার্ডস!' হুঙ্কার ছাড়ল কমান্ডার। 'এদের ওপর নজর রাখো, কেউ যাতে পালাতে না পারে!'

অপমান বোধ করল রানা, কিন্তু কথা বাড়াল না। ঝট করে মালয়েশিয়ান সার্জেন্ট রহিম শেখ চলে এলো রানার সামনে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সার! অর্ডার দিন!' তার অধীনস্থ সৈন্যরা শক্ত করে ধরল রাইফেল। প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কর্নেল রানা যদি আদেশ দেন তা হলে সম্মান রক্ষার প্রয়োজনে মরতেও রাজি।

'না,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'ওরা আমাদের ভুল বুঝছে। কমান্ডার বোধহয় রেডিওতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেছেন, উনি ফিরে আসুন, তারপর তাঁর সঙ্গে কথা আছে আমার। কোন গোলাগুলিতে যাব না আমরা।'

পনেরো মিনিট পরে ফিরল কমান্ডার, এখন তার চেহারায় আগের সেই দাম্ভিক ভাবটা নেই। সামনে দাঁড়িয়ে রানার দিকে হাত বাড়াল।

'সরি,' জখমটা দেখিয়ে বলল না। 'হাত মেলাতে পারছি না।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল কমান্ডার। 'আপনি কে তা না জেনে…'

মৃদু হাসল রানা। 'বাদ দিন।' সংক্ষেপে কমান্ডারকে কবীর চৌধুরীর কীর্তি জানাল ও, চেপে গেল যে মালয়েশিয়ানদের তৈরি ভাইরাসই সে চুরি করছিল, তারপর বলল, 'কবীর চৌধুরী কিন্তু সাবমারসিবলে করে প্রতি মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে।'

'ঠিক! এক্ষুণি ওয়্যারলেসে আমাদের সাবমেরিনগুলোকে সতর্ক করে দিচ্ছি আমি।'

'তা হলে সময় নষ্ট করবেন না,' চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর করে তুলল রানা।

রানার কাঁধে একটা আন্তরিক চাপ দিয়ে সৈন্যদের দিকে ফিরল কমান্ডার। 'প্রাইভেটস! লেট্স্ গেট ব্যাক টু আওয়ার

পোস্ট! হারি!'

রওনা হতে গিয়েও ঘুরে হাত নাড়ল কমান্ডার, আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করল বাড়াবাড়ি করবার জন্য।

'না, না, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি,' বলল রানা। 'শীঘ্রি যান, দেখুন লোকটাকে ধরতে পারেন কি না।'

আমেরিকানরা স্নো-ট্র্যাকে চেপে চলে যাওয়ার পরে হাতের ইশারায় সবাইকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, বুঝতে পারছে বিরাট একটা দায়িত্ব যতোটা সম্ভব সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পেরেছে ও।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অন্ধকারের বন্ধু

কাজী আনোয়ার হোসেন

কারা যেন প্রচণ্ড তাপ তৈরি করছে।
চোখের পলকে টন টন ইস্পাত পর্যন্ত গলে যাচ্ছে।
শুধু তৈরিই করছে না, দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায়
পাঠাবার প্রযুক্তিও আবিষ্কার করেছে।
সেই অবিশ্বাস্য তাপের আঁচ একটুখানি
বাংলাদেশের গায়েও লাগল।
অমনি ডাক পড়ল এমআরনাইনের।

আকাশ থেকে নেগেভ মরুভূমিতে নেমে এল রানা,
জানে না আগে থেকে খবর পেয়ে
মোসাদ আর ইজরায়েলি সেনাবাহিনী
নিশ্ছিদ্র ফাঁদ পেতে রেখেছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? **—কা. আ. হোসেন।**

এম. এ. করিম হাসান মুন্না,
বাইশারী, বানারীপাড়া, বরিশাল।

আমি রানা সিরিজের একজন অন্ধ ভক্ত। এইমাত্র 'মহাবিপদ সঙ্কেত' বইটি শেষ করলাম। রানার দেশপ্রেম দেখে আমার বুকটা দেড় ইঞ্চি বেড়ে গেল। আপনার লেখার গুণে বইয়ের প্রতিটি ঘটনা চোখের ঠিক যেন সামনে বাস্তবে ঘটতে দেখেছি।

প্রায়ই আমার একটা সমস্যায় পড়তে হয়। রানার বই পড়তে পড়তে রাত ২টা-৩টা বেজে যায়, বই শেষ না করে ঘুমাতে পারি না। আর এই ঘুম থেকে জেগে দেখি সকাল তখন ৯টা-১০টা। তখন তাড়াহুড়ো করে কলেজে পৌঁছতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়।

এর কি কোনও প্রতিকার আছে আপনার কাছে?

নাহ্। প্রতিকার আছে আপনার কাছেই। রানা পড়বার সময়টা সামান্য একটু হেরফের করে নিন। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

শ্রাবণ,
১৫ অরফানেজ রোড, লালবাগ, ঢাকা।

'পালাবে কোথায়' বইটা এইমাত্র শেষ করলাম। ভীষণ ভাল লেগেছে। তবে সোহানার কী হল বুঝলাম না। ওকে নিয়ে টেনশনে আছি। ওর জীবন-মরণের প্রশ্নে হেঁয়ালী না করে সমাধানটা একটু জানাবেন?

মরণখেলা, আবার সেই দুঃস্বপ্ন, কালপ্রিট, মুক্ত বিহঙ্গ, চাই সাম্রাজ্য, অনুপ্রবেশ, এবং এরকম আরও বই/ভলিউম আমি বাংলাবাজারে খোঁজ করেও পাচ্ছি না।

প্রথম দুই বই খুব শীঘ্রি আসছে, পরের তিনটি বাজারে আছে, অনুপ্রবেশ কিছুদিন দেরি হবে। আর সোহানাকে তো কবে থেকেই দেখছি. দিব্যি বহাল তবিয়তে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। এদের বিড়ালের জান–কাজেই টেনশন করবেন না।

প্লাবন,

চকলোকমান, কলোনীবাজার, বগুড়া।

আমি সেবা প্রকাশনীর পাঠক সেই ক্লাস সিক্স থেকে। মেঘে মেঘে অনেক বেলা বয়ে গেছে, অবশেষে আমি এখন রানার মত একই র‍্যাঙ্কে কর্মরত, ডিপার্টমেন্টটা শুধু আলাদা।

এবার কিছু সংশোধনী। 'হারানো মিগ' পৃ ১১তে ফ্লাইং অফিসার নিয়াজ বলছে....শহীদ, তুমি রেডি; জবাবে শহীদুল্লাহ বলছে ...একটু দেরি হবে, সার।

উল্লেখ্য, শহীদুল্লাহর র‍্যাঙ্ক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, আর নিয়াজের র‍্যাঙ্ক ফ্লাইং অফিসার। তাকে শহীদুল্লাহ সার বলতে পারে না। কারণ, গঠনতন্ত্র হিসাবে র‍্যাঙ্কের ক্রম হচ্ছেঃ ১. পাইলট অফিসার, ২. ফ্লাইং অফিসার, ৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, ৪. স্কোয়াড্রন লিডার ইত্যাদি।

অতএব, জুনিয়র অফিসার হয়ে নিয়াজ ভুল করেও সিনিয়র অফিসার শহীদকে 'তুমি' সম্বোধন করবে না। কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।

আর একটি ভুল, মিসফায়ার শব্দটির অপব্যবহার। 'টপসিক্রেট-২' পৃ ৪৪-এ পিস্তলটা ইয়াহুদের মুখের সামনে মিসফায়ার করে। মাযল ফ্ল্যাশ মাথার ডান দিকটাকে পুড়িয়ে দেয়। আসলে, বুলেট মিসফায়ার করলে তো গুলিই বেরোবে না পিস্তল থেকে, সেক্ষেত্রে মাযল ফ্ল্যাশের প্রশ্নও উঠবে না।

ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

জুয়েল রানা,

যশোর পলিটেকনিক রোড, যশোর-৭৪০০।

এবার এক সাথে দুটি বই হাতে পেলাম। 'অপারেশন কাঞ্চনজংঘা' এবং 'গহীন অরণ্য'। ভিন্ন স্বাদের দুটি বই-ই দারুণ লেগেছে। অনেক দিন পর দুটি বই পরপর শেষ করলাম। সত্যি, কাজীদা, দুটি বই-ই

অসাধারণ হয়েছে, তাই আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। আর হ্যাঁ, মাসুদ রানা সিরিজের ভলিউম বের করছেন না কেন? পরিশেষে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদেরকে এই সমস্ত বই উপহার দিচ্ছেন তাঁদের আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আপনিও আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিন। ভলিউম শব্দটি না বলে আমরা একত্রে রানার দুটি বই এবং দুই বা তিনখণ্ড একত্রে করে রিপ্রিন্ট করছি প্রায় প্রতি মাসেই। আপনি পাচ্ছেন না?

মোঃ সাজ্জাকুল হায়দার,

সরকারী তিতুমীর কলেজ, মহাখালী, ঢাকা।

আপনি অতি বড় একটা অন্যায় করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে। কতোদিন হলো সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর 'নড়েচ কী মরেচ' শোনা থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। বলি, আপনি সত্যি গিলটি মিয়াকে ভুলে গেলেন? আবার 'মহাবিপদ সঙ্কেত'-এ দেখলাম তাপসী রায় বলছে, গিলটি মিয়া ভাল তো? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গিলটি মিয়া সত্যি ভাল আছে তো? যদি থাকে তো আপনার আগামী দু'একটা বইয়ে আমরা তার উপস্থিতি কামনা করি। এই মাত্র 'গহীন অরণ্য' শেষ করলাম। অনেকদিন পরে অরণ্যের মাঝে রানাকে পেয়ে ভালই লাগল। কিন্তু বইয়ের শেষে যে বলা আছে রানার সঙ্গে ওর বান্ধবী লরেলি আছে? তার জায়গায় আমরা তার চাচাতো বোন সিসিলিয়াকে দেখলাম। এটা কি ছাপার ভুল না আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। এই সিরিজে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, 'অগ্নিপুরুষ' ও 'সেই উসেন' বই দুটি। পরিশেষে আপনাকে শুভেচ্ছা ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমিও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ...প্রচ্ছদ ছাপা হয়ে গিয়েছিল আগেই, পরে লরেলিকে এই অভিযানে একেবারেই বেমানান লাগবে মনে করে বাদ দেওয়া হয়। ...কেন, 'শয়তানের উপাসকে' গিলটি মিয়াকে পাননি? উপযুক্ত কাহিনীতে ঠিকই ও হাজির হয়ে যাবে আবার।

জি মাওলা,

শেখপাড়া, রাজশাহী।

রানার শেষ বইটা পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। আচ্ছা, কাজীদা, শওকত হোসেনের লেখা 'ত্রাহি' ওয়েস্টার্নটির এক পার্শ্ব চরিত্রের নাম স্যান্ডার্স। আবার তাহের শামসুদ্দীনের 'স্যান্ডার্সের রক্ত চাই' বইটির

নায়কও স্যান্ডার্স। দুটি কি একই চরিত্র?

না। ওটা নেহায়েতই নামের মিল।

আ.খ.ম. খায়রুল আলম,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বইটির নাম মনে নেই, এক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে আপনি সম্ভবত বলেছিলেন যে হাত গুটিয়ে বসে থাকলাম কই, এতোগুলো কিশোর উপন্যাস লিখলাম। কিন্তু, কাজীদা, কিশোরদের জন্য তো অনেকগুলো সিরিজ আছে, আবার আপনি ছদ্মনামে তিন গোয়েন্দা লেখা শুরু করলেন? আমরা কি 'দাঁড়াও পথিক', 'বিষ', 'বন্দিনী', 'রহস্যময়ী', 'আর্তনাদ'-এর মতো রোমাঞ্চ উপন্যাস আপনার কাছ থেকে আর পাব না?

যাক, মাসুদ রানার সর্বশেষ বই 'গহীন অরণ্য' খুবই ভাল লেগেছে। সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি 'তিন গোয়েন্দা' লিখছি তা কে বলল আপনাকে? কিশোর উপন্যাস বলতে আমি বুঝিয়েছিলাম 'ইসকুল বাড়ি', 'ক্লাস এইট', 'ছোটকুমার', 'ফুলবাগান', 'ইতিকথা', 'ঘরের শত্রু' এসব উপন্যাসের কথা। সময়, সুযোগ ও ইচ্ছে হলে বড়দের জন্য রহস্যোপন্যাস নিশ্চয়ই লিখব। 'গহীন অরণ্য' ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। ধন্যবাদ।

জুলফিয়া তাসনীম মৌ,

ঠিকানা নেই।

শেষ পর্যন্ত মাসুদ রানা সিরিজ ধরেই ফেললাম! ট্রিপল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছি। প্রথম বলেই (অগ্নিপুরুষ) বিরাট এক ছক্কা হাঁকিয়েছিলাম। আপনার এই অসাধারণ বলটি সম্বন্ধে মন্তব্য করার দুঃসাহস আমার নেই। অনেকবার রিপ্লে দেখেও সাধ মেটেনি। এরপর আপনার 'সেই উসেন', 'অপহরণ', 'প্রলয় সঙ্কেত', 'মাফিয়া', 'পালাবে কোথায়', 'আমিই রানা', 'বিস্মরণ', 'আই লাভ ইউ ম্যান', 'আমি সোহানা', 'বিদায় রানা', 'মৃত্যুফাঁদ' ও 'স্পর্ধা' বলগুলোকে সীমানা পার করানোর পর বলতে পারেন আমি একরকম বাতাসেই ভাসছি। তবে ইদানীং আপনার পারফর্মেন্স আর অতীতের রেকর্ড দেখে হতাশ হয়ে বলছি, লাইন-লেংথের ব্যাপারে আপনাকে আরও মনোযোগী হতে হবে। সেই সাথে ভিআইপি গ্যালারিতে প্রিয়মুখ রূপাকে দেখতে চাই।

সবশেষে সুন্দর চিঠির জন্য যশোরের আঁচল ও নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের মিশুকে শুভেচ্ছা।

দুঃখিত। ঠিকানা নেই, তাই উত্তরও নেই।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/৪/'০৪ মোমপিশাচের জাদুঘর (তি.গো/সেবা D/D) শামসুদ্দীন নওয়াব

বিষয়: ডক্টর স্টোকারের ভ্রাম্যমাণ মোমের জাদুঘর এসেছে কিশোরদের শহরে। ওদের টীচার মিসেস মুর ক্লাসের সবাইকে নিয়ে গেলেন জাদুঘর দেখাতে। কিন্তু এ কী! এ কোথায় এসে পড়ল ওরা? জাদুঘরে ঢুকবার পর থেকেই ঘটতে শুরু করল আশ্চর্য সব ভূতুড়ে ঘটনা। একের পর এক আসছে আক্রমণ। প্রাণসংশয় দেখা দিল তিন গোয়েন্দার। কিন্তু কী ওদের অপরাধ কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা। ফলে, জড়িয়ে পড়তেই হলো রহস্যের জালে।

২৭/৪/'০৪ রহস্যপত্রিকা (২০ বর্ষ ৭ সংখ্যা) মে, ২০০৪

আরও আসছে

৫/৫/'০৪ ভেল্কিবাজ (তি. গোয়েন্দা/কি.থ্রিলার) শামসুদ্দীন নওয়াব

৫/৫/'০৪ চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট (কিশোর ক্লাসিক) ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট/ নিয়াজ মোরশেদ

১০/৫/'০৪ খুনে শহর (ওয়েস্টার্ন) গোলাম মাওলা নঈম

১০/৫/'০৪ সাগরতলে+ মাইকেল স্ট্রগফ+গুপ্তরহস্য (জুল ভার্ন ভলিউম-৪) জুল ভার্ন/ শামসুদ্দীন নওয়াব